শৈলী

দেশের প্রথম শিল্প ও সাহিত্য ব্লগ

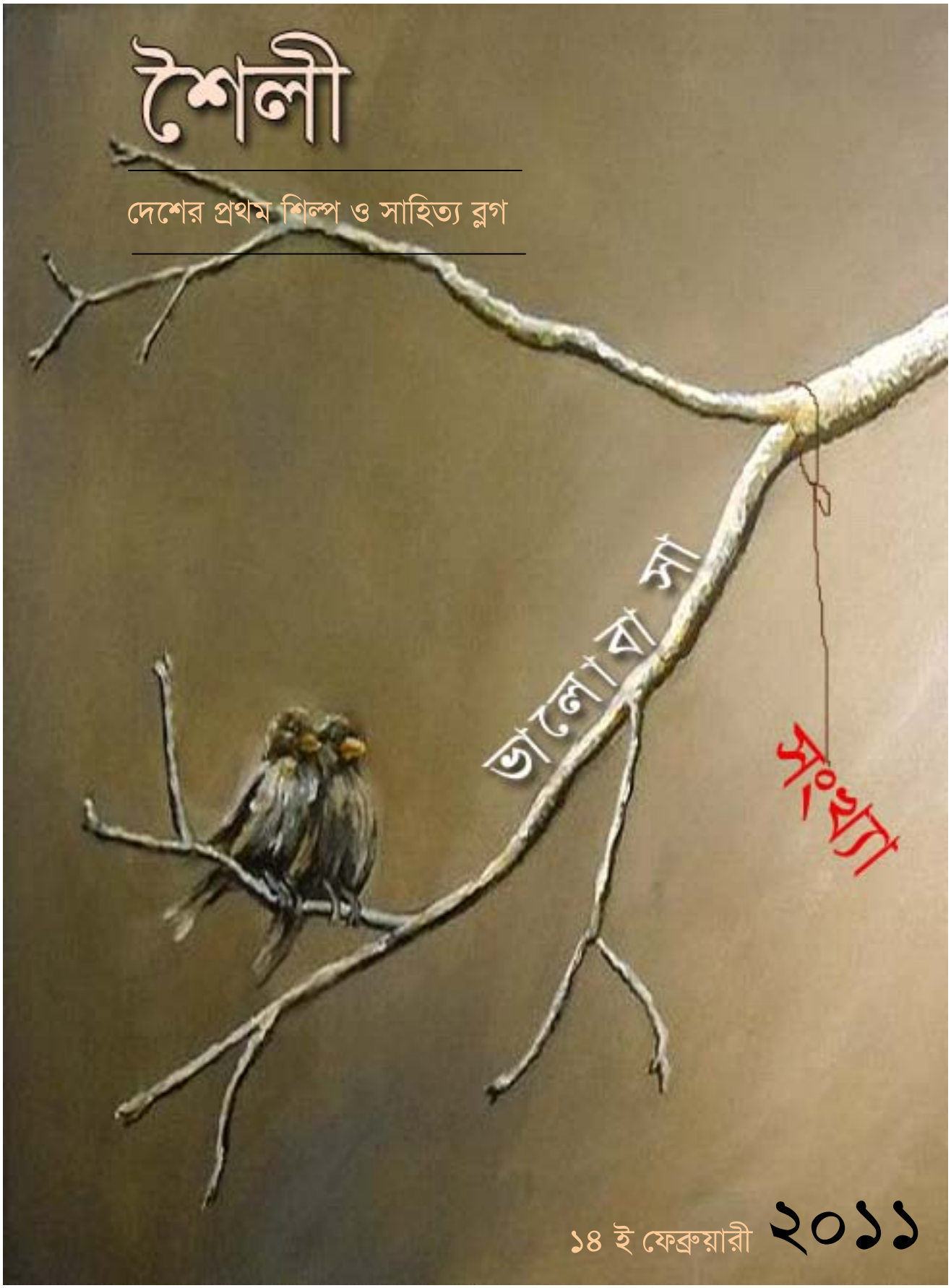

১৪ ই ফেব্রুয়ারী ২০১১

উৎসর্গ

সকল মুক্তিযোদ্ধার উদ্দেশ্যে,

চিরদিন বেঁচে থাক তোমরা সবার হৃদয়ে।

http://shoily.com

.....ইভটিজারদের থু!

শৈলী

ভালোবাসা সংখ্যা, ২০১১

শৈলী.কম -এর ভালবাসা আয়োজন,
১৪ই ফেব্রুয়ারী ২০১১

শৈলী

ভালোবাসা সংখ্যা, ২০১১

শৈলী.কম -এর ভালবাসা আয়োজন,
১৪ই ফেব্রুয়ারী ২০১১

সম্পাদক
রিপন কুমার দে

বিষয় সম্পাদক
ফারুক হোসেন
জুলিয়ান সিদ্দিকী
সামসুল ইসলাম
সানজিদা খাতুন

প্রচ্ছদ
দারশীকার
(পোস্ট-ছবি অর্ন্তজাল থেকে সংগৃহীত)

অলঙ্করণ
শৈলী ম্যাগাজিন টিম

প্রকাশক
শৈলী প্রকাশনা, শৈলী.কম
©shoily.com

স ম্পা দ কী য়

শৈলী বাংলাদেশের প্রথম শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ক ব্লগ। অনেক শ্রম, অনেক সময়ের বিনিময়ে তিলে তিলে বেড়ে উঠছে এই নতুন ব্লগ পোর্টালটি। আর এর পিছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা সম্মানিত শৈলারদের, যাদের ঐকান্তিক সহায়তা, মননশীল লেখা শৈলীকে আজকের এই অবস্থানে নিয়ে এসেছে। শৈলীর শুরুতে ছিল আপনাদের পরিশীলিত বিশ্বাস আর নিগূঢ় ভালবাসা। শুধুমাত্র অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতাই পেয়েছি শুভেচ্ছার অজস্রতায়। অতঃপর হাঁটি হাঁটি পা পা করে অতিক্রান্ত হলো অনেক মাস। সময়ের আবর্তনে আরও গভীর হলো আত্মিক বন্ধন। তারই রেশ ধরে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছে এতদূর। শৈলীর এই ভালবাসা সংখ্যাটি "শৈলী"-র একটি বিশেষ প্রকাশনা। প্রথম অনলাইন-বুক হিসেবে নি:সন্দেহে থাকবে অনেক ভুলভ্রান্তি, অপরিপক্কতা।। আপনাদের ক্ষমাসুন্দর মনোভাব এবং ভালবাসা নিরন্তর কামনা করে শৈলী।

যারা লেখা জমা দিয়েছেন তাদেরকে আমাদের কৃতজ্ঞতা। আর বাছাইয়ে অনেকের লেখা বাদ পড়ায় আমরা আন্তরিকভাবে দু:খিত। শৈলী টিম ব্লগারদের পাশাপাশি যোগাযোগ করে নির্মলেন্দু গুণ, টোকন ঠাকুর, লুৎফর রহমান রিটন, মলয় রায়চৌধুরী, মাহাবুবুল হাসান নীরু, মোস্তফা প্রকাশ এবং আরও অনেকের সাথে। প্রায় সকলেই বিভিন্ন রচনা দিয়ে সহায়তা করেছেন। সবাইকে কৃতজ্ঞতা।

১৪ই ফেব্রুয়ারি। বাঙালির যা কিছু নিজস্ব, তার মধ্যে হয়তো ভ্যালেন্টাইন দিবসের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু ভালবাসা এমনই শাশ্বত যে, তা কোনো নির্দিষ্ট দেশ-গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এমনই ভালবাসা দিবসে ক্ষীণ হলেও সবার অর্ন্তলোকে স্পন্দিত হওয়ার অভিপ্রায় নিয়ে শৈলীর এই বিশেষ আয়োজন।

ভ্যালেন্টাইন দিবসের মেজাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে নতুন ভালবাসার সাহিত্যের স্বাদ। সেই ভালবাসার সাহিত্য সম্ভার পুস্পার্ঘ্যের মতো নিবেদিত হলো এই বিশেষ সংখ্যার পাতায় পাতায়, প্রতিটি কোণে। একটা সুন্দর সাহিত্য আকাশের স্বপ্ন দেখি আমরা, শুনি অবারিত সৃজনশীলতার শ্রুতিমধুর সুর। শুভ এবং মঙ্গলময় পরিভ্রমণের কামনায়।

সবাইকে ভালবাসার শুভেচ্ছা

ঘৃণাভরে

স্মরণ করি

স্বাধীনতাবিরোধী চলচ্চিত্রের সকল

অকৃতজ্ঞ আর মৃত বিবেককে

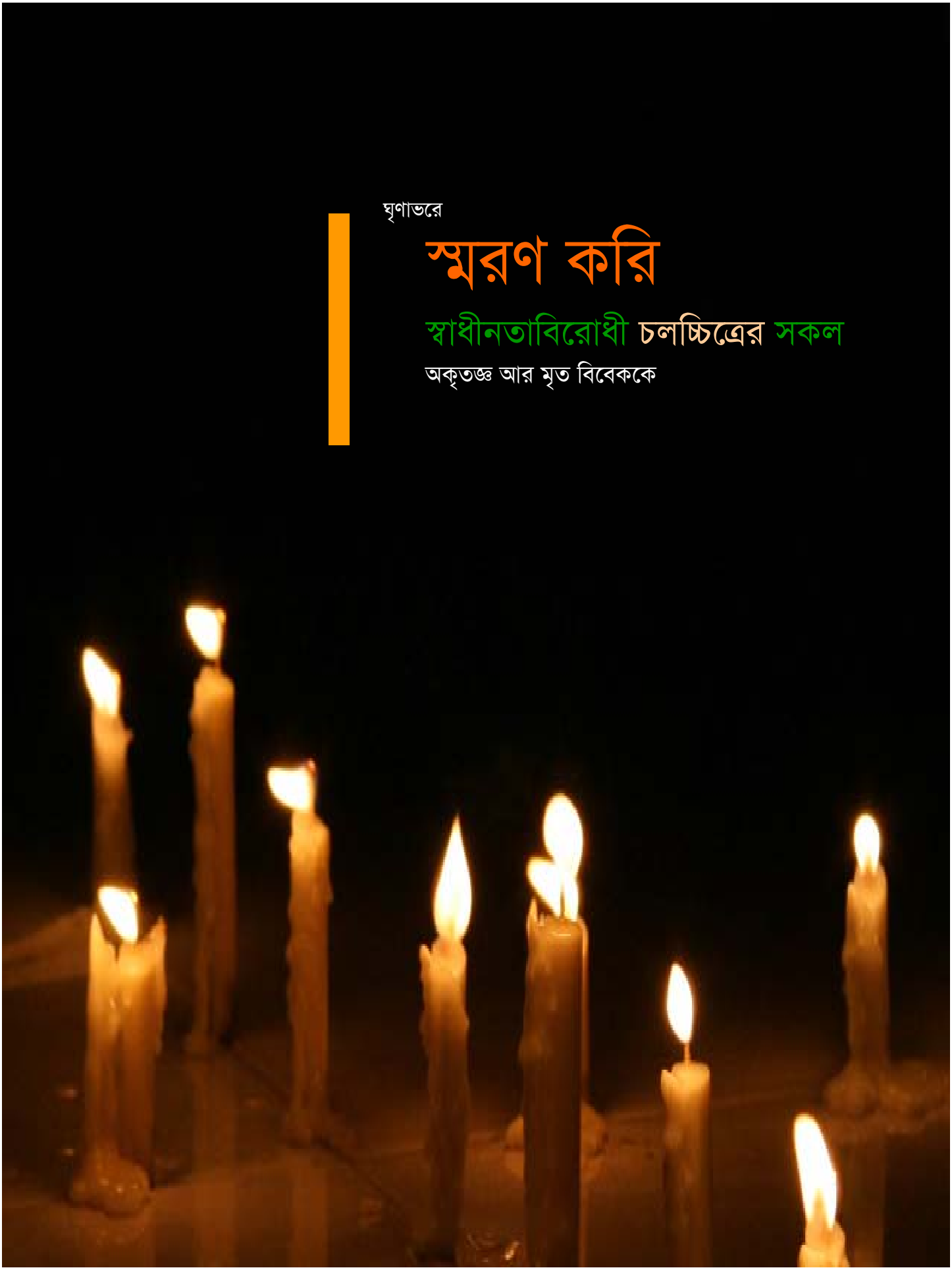

সূ চি প ত্র

সম্পাদকীয়	শৈলী ই-বুক	/রিপন কুমার দে	১
প্রধান রচনা	রহস্যপুর গল্পটি পড়া শেষ হয়নি	/টোকন ঠাকুর	৫
নির্মলেন্দু গুণের কবিতা	চার লাইনের কবিতা	/নির্মলেন্দু গুণ	৬
বিশেষ রচনা	সাক্ষাৎকার	/লুৎফর রহমান রিটন	৭
ছোটগল্প	বাবা, অন্তু হারিয়ে গেছে	/মাহাবুবুল হাসান নীরু	১৩
কবিতা	অভ্রপুষ্প	/মলয় রায়চৌধুরী	২১
ছোটগল্প	একটি প্রেমের গল্প: গ্রীনজোরী	/কুলদা রায়	২২
কবিতা	প্রভাতের প্রণয়গুচ্ছ	/ফকির ইলিয়াস	২৭
স্মৃতিরোমন্থন	আমি বাঁচতে ভীষণ ভালোবাসি	/ফয়সল অভি	২৮
কবিতা	প্রবাহ-প্রবণ	/শৈবাল	৩১
প্রবন্ধ	মেয়েদের দিকে আমরা কেন তাকাই?	/মলয় রায়চৌধুরী	৩২
গল্প	ধূসর প্রেমের প্রথম চিঠি	/প্রহরী	৩৫
কার্টুন	কাওসারের কার্টুন	/কাওসার	৪৬
গল্প	একটি প্রেমের সমাধি অথবা অজ্ঞতার অন্ধকার	/জুলিয়ান সিদ্দিকী	৪৭

সূ চি প ত্র

কবিতা	জাগতিক সমীকরণ	/রাজন্য রুহানি	৫৮
অণুগল্প	মেঘরঙা দিন	/রাবেয়া রব্বানি	৫৯
সাক্ষাৎকার	চলচ্চিত্র	/মোস্তফা প্রকাশ	৬৬
গল্প	কথাসঙ্গী বিহনে	/মামুন ম. আজিজ	৬৯
কবিতা	তোমাকে চাওয়ার নিমিত্তে	/চারুমান্নান	৭৬
কবিতা	দ্বিতীয় মৃত্যু	/রকিবুল ইসলাম	৭৭
প্রবন্ধ	কবি সাহিত্যিকদের জীবনে ভালোবাসা	/নীলা	৭৮

প্রধান ফিচার

রহস্যপুর গল্পটা পড়া শেষ হয়নি

শৈলার টোকন ঠাকুর

...খুবই জানি, সুস্থ হলেই আবারও সেই ষড়যন্ত্র, প্রজাপতির। হয়তো আমারও খুব ইচ্ছে করবে, তার ডানার খোপের অন্ধকারে রং মেখে ঘুমিয়ে থাকি, জাগি। বোঝাই তো যাচ্ছে, এরপর গল্পে একটা খুন এসে যাবে.....

আমি সিরিয়াস পাঠক। পড়তে পড়তে পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা এগিয়ে যাই, তাকিয়ে দেখি গল্পের মধ্যে সোনার ঢেঁকি... পাড়ের শব্দও শুনি। ঠিক তক্ষুণি, পর্দাজুড়ে দৃশ্যমান, হাঁক দিয়ে চলে যাচ্ছে দইঅলা বলে একটা চরিত্র, আমি তার পিছু পিছু এগিয়ে যাই কয়েক পৃষ্ঠা; হঠাৎ সামনে পড়ে পোড়ো রাজবাড়ি, রাজবাড়িটা ভাঙা ভাঙা এবং ভৌতিক... ভীতিলুব্ধ সিঁড়িতে একটা প্রজাপতি, আমি প্রজাপতিকে লক্ষ করে উপরে উঠতে থাকি। প্রত্নকোঠার ছাদের কিনারে গিয়ে বলি, 'প্রজাপতি, তোমার আত্মজীবনী আমি মুখস্থ করতে চাই', শুনেই, ডানাঅলা এই প্রায় পাখিটি উড়ে যায়। এবার আমিও উড়তে থাকি প্রায়পাখিটির সঙ্গে, পৃষ্ঠার পরে পৃষ্ঠা, বাক্যের পর বাক্য, শব্দের পরে শব্দ, প্রয়োজনীয় নৈঃশব্দ... প্রজাপতি, আমাকে তুমি কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? তুমি কি কোনো বংশিবাদক, সুরের ফাঁদে ষড়যন্ত্র করছ? ট্র্যাপ করে পাহাড়ের দিকে টানছ?

রহস্যপুর গল্পের তেইশতম পৃষ্ঠায় সেই হাইডআউট লোকেশন, পাঠক যেখানে অসহায়, দুরুদুরু-সন্ত্রস্ত কিন্তু এগিয়ে যেতে উৎসাহী। প্রতিষ্ঠিত অন্ধকারে মুখোমুখি এক মায়াবী অধ্যায়: আলো হয়ে প্রকাশিত নারী, নারীর সর্বাঙ্গে সদম্ভ আগুন, অহোরাত্র নারীকে পড়তে গিয়েই আগুনে পুড়তে হয়... এই নিয়তি নির্ধারিত বলে, মন পুড়ে যায়। পোড়া মন চিকিৎসাধীন... নার্সও দেখতে প্রায়নারী, মাসান্তে বেতনপ্রাপ্তা।

আমি রহস্যপুর হাসপাতালে শুয়ে আছি, গল্পের মাঝামাঝি কোনো পৃষ্ঠায়। ...খুবই জানি, সুস্থ হলেই আবারও সেই ষড়যন্ত্র, প্রজাপতির। হয়তো আমারও খুব ইচ্ছে করবে, তার ডানার খোপের অন্ধকারে রং মেখে ঘুমিয়ে থাকি, জাগি। বোঝাই তো যাচ্ছে, এরপর গল্পে একটা খুন এসে যাবে। টিকটিকিরাও জানাচ্ছে, চিরকালই খুনের প্রেরণা নারী। সিরিয়াস পাঠক আমি, হিট লিস্টে আছি, সুতরাং খুন হয়ে যাব- এই ভয়ে অসুস্থ থাকি। হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে (জন্মদোষে) নার্স ও নারীর আন্ত:পার্থক্যটুকু ধরার চেষ্টা করছি, পড়ার চেষ্টা করছি... আমার পোড়ামন চিকিৎসাধীন

এদিকে বসন্তদিন!!

টোকন ঠাকুর

নিজের সম্পর্কে: আমি একটি রাক্ষস, মানুষের ছদ্মবেশে থাকি, কবিতা লিখি।

ভালবাসেন: মানুষ।

প্রিয় ব্যক্তিত্ব: ফিদেল কাস্ত্রো, ইন্দিরা গান্ধী।

অবসরে: আমার কোন অবসর নাই।

নতুন কবিদের উদ্দেশ্যে: রক্ত দিয়ে কবিতা লিখ।

কবিতা

নির্মলেন্দু গুণের নতুন কবিতা

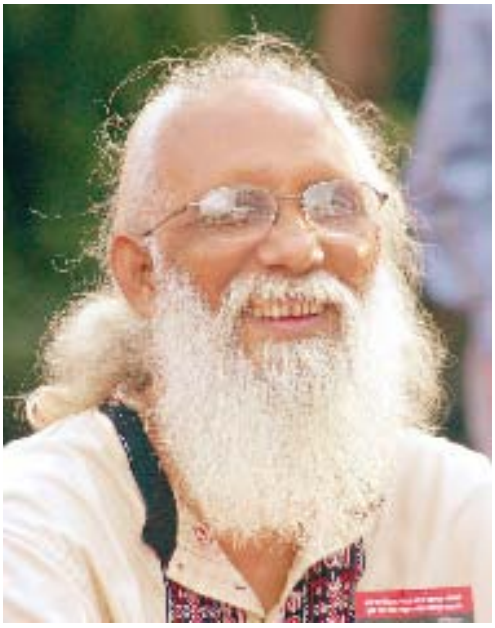

নির্মলেন্দু গুণ

আমরা **শৈলী** ই-বুকের জন্য যোগাযোগ করেছিলাম প্রখ্যাত কবি **নির্মলেন্দু গুণের** সাথে। তিনি ব্যস্ততম সময়ের মধ্যেও আমাদের জন্য নতুন ছোট্ট একটি কবিতা উপহার দেন। এ জন্য আমরা কবির কাছে কৃতজ্ঞ।

জন্ম: ১৯৪৫, বার্হাট্টা, নেত্রকোণা।
প্রথম কবিতার বইয়ের
প্রকাশকাল: ১৯৭০
প্রকাশিত বই: ৪২ টি

চার লাইনের কবিতা

“আমি জন্মের প্রয়োজনে,
ছোট হয়েছিলাম।
এখন মৃত্যুর প্রয়োজনে,
বড় হচ্ছি”।।

বিশেষ ফিচার

সা ক্ষা ৎ কা র

"আমি আশা রাখি, এই শৈলী মাধ্যমটি থেকেই আগামীতে অনেক ভালো লেখকরা আসবেন..."

লুৎফর রহমান রিটন বাংলাদেশের খুব পরিচিত একটি নাম। বাংলাদেশের খ্যতিমান ছড়াকার এবং কলামিস্ট। সম্প্রতি শৈলীর ই-বুক সংখ্যার জন্য শৈলীর মুখোমুখি হন লুৎফর রহমান রিটন। আমাদের সাথে আড্ডা দেন অনেকসময় বইমেলা নিয়ে। তারই কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হচ্ছে শৈলী প্রতিবেদকের মাধ্যমে। সাক্ষাৎকারটি নেন শৈলী ই-বুক সম্পাদক।

বইমেলা

লুৎফর রহমান রিটন

শৈলী প্রতিবেদক: কেমন আছেন?
লুৎফর রহমান রিটন: খুব ভাল আছি।

শৈলী প্রতিবেদক: আচ্ছা, অমর একুশে বইমেলা বাংলাদেশে নতুন লেখক সৃষ্টিতে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলে আপনি মনে করেন?

লুৎফর রহমান রিটন: আসলে বইমেলা প্রকৃতপক্ষে বই বিক্রিতেই বেশি ভূমিকা রাখে, নতুন লেখক সৃষ্টিতে না। লেখক সৃষ্টি হয় সাহিত্যপাতায়, সাহিত্য পত্রিকায়। বইমেলায় লেখকরা বই লিখবেন, প্রকাশকরা তা বের করবেন। পাঠকরা তাদের বই পড়বেন। লেখক সম্বন্ধে তাদের আস্থা জন্মাবে। তারপর পাঠকরা আবারও তাদের বই পয়সা দিয়ে কিনবেন। বইমেলাতে পাঠকরা নতুন লেখকদের বই সাধারণত কিনতে চায় না। আমি তো প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দের বই -ই প্রথমে কিনব। যেসব লেখকদের নামই আমি চিনি না, তাদের বই তো আমি সাধারণত কেনার আগ্রহ বোধ করব না।

সাক্ষাতকার

শৈলী প্রতিবেদক: তাহলে নতুন লেখকদের সাহিত্যজগতে আসার জন্য আপনি কি পন্থা অবলম্বন করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

লুৎফর রহমান রিটন: নতুনদেরকে অবশ্যই ভালো লিখতে হবে। এবং তাদেরকে পাঠকদের কাছে পৌছোনোর জন্য পত্রপত্রিকায় নিয়মিত তা প্রকাশ করতে হবে। সেখানকার পাঠকদের প্রথমে আকৃষ্ট করতে হবে। অনলাইনে নিয়মিত লিখতে হবে। এবং এতেই পাঠকদের সাথে তার একটা সংযোগ স্থাপন করতে হবে। খুব কম লেখকই আছেন, যিনি ভাল লিখেন কিন্তু পাঠকদের আকর্ষন করতে পারেন নি, এরকম ঘটনা খুব কমই ঘটে। পাঠকরা কিন্তু নতুন লেখকদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। কিন্তু তাকে সুযোগটা করে দিতে হবে। আর তাকেই প্রমাণ করে দিতে হবে যে, আমি ভালো লিখি। উদাহরণস্বরূপ আপনি যদি ভালো ফুটবলার খেলোয়ার হন, আপনি তো সাথে সাথে জাতীয় টিমে খেলতে পারবেন না। আগে তো ছোট ছোট দলে খেলতে হবে, এভাবেই দর্শকদের আকৃষ্টতা অর্জন করতে হবে নতুনদের। লেখালেখিটা তেমনি। ধরেন আপনি খুবই ভালো লিখেন, অসাধারন লিখেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনাকে ধীরে ধীরে পাঠকমহলে স্থান করে নিতে হবে। এভাবেই প্রতিষ্ঠা পাবে আপনার অবস্থান। আমি নিজেও এই সময়ের মধ্য গিয়েছি। তাই আমি জানি কিভাবে একজন নতুন লেখককে লড়াই করতে হয়। তাই তরুণদের প্রতি আমার সমসময় ভালোবাসা থাকবে। অনেক সময় প্রচুর চিত্তাকর্ষক বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। সেই বিজ্ঞাপনে বিভ্রান্ত হয়ে অনেকসময় পাঠকরা কিনে ফেলেন। কিন্তু বই পড়ে পাঠকরা পরবর্তীতে ওই লেখকদের বই কেনার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

পুরষ্কার গ্রহণে....

সাক্ষাতকার

শৈলী প্রতিবেদক: বইমেলায় বইয়ের গুনগত মান রক্ষা করে কোন নতুন বই বের করার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির কোন ভূমিকা নেওয়া উচিত বলে কি আপনি মনে করেন?

লুৎফর রহমান রিটন: না, আমি তা মনে করি না। কারন কারন যিনি লিখবেন তিনি নিজেই নিজের মান রক্ষা করবেন। যিনি নতুন লিখবেন, তাকে বিপুল পড়তে হবে। যারা নতুন লেখক, বিভিন্ন সাহিত্য পাতা পড়েনি না, তারা কখনই ভালো সাহিত্য রচনা করতে পারবেনই না। আপনার সমসাময়িক লেখদের সম্বন্ধে ধারনা থাকতে হবে, পূর্ববর্তী লেখকদের সম্বন্ধে ধারনা থাকতে হবে। তবেই ভালো ভালো লেখা আসবে আপনার মধ্য থেকে।

শৈলী প্রতিবেদক: রবীন্দ্র পরবর্তী সময়ে বিশ্বসাহিত্যে বাংলা সাহিত্য তেমন আশানুরূপ কোন অবস্থান করে নিতে পারছে না, এ ব্যাপারে আপনি কি বলবেন?

লুৎফর রহমান রিটন: সত্যিকার অর্থে একজন লেখকের নিজস্ব ভাষার রচনা কখনই যথাযথভাবে অনূদিত করা সম্ভব না। তারপরও আমি এখানে অনুবাদ ঘাটতির কথাই বলব। আমাদের দেশে সেরকমভাবে সাহিত্য অনুবাদ করা হচ্ছে না। যার কারনে আমাদের সমৃদ্ধ সাহিত্য থাকা সত্ত্বেও বিশ্বের দরবারে তা পৌছুতে পারছি না।

শৈলী প্রতিবেদক: আচ্ছা আমরা জানি আপনি প্রতিবার বইমেলায় কানাডা থেকে বাংলাদেশে ছুটে চলে আসেন এই প্রাণের মেলায়, তো এবারের বইমেলায় কি কোন পরিবর্তন লক্ষ করেছেন?

লুৎফর রহমান রিটন: আমার যতটুকু মনে পড়ে গতবছর বইমেলায় বাংলা একাডেমির হিসাব মতে বিক্রির পরিমান প্রায় ২৫ কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছিল, এবারের বইমেলায় তা দ্বিগুন হবে বলে ধারনা করা হচ্ছে! এটা সত্যি একটা আশার দিক। তবে অমর একুশে বইমেলা আমাদের প্রাণের মেলা। এ মেলা শুধু বই কেনাবেচার মেলা নয়, এখানে আমরা আসি প্রাণের টানে। আর এ ভাষার সাথে জড়িয়ে আছে আমাদের অনেক ত্যাগ, অনেক ভালোবাসা।

সাক্ষাতকার

শৈলী প্রতিবেদক: প্রায় একই সময়ে উদযাপিত বাংলাদেশের বইমেলার সাথে কলকাতার বইমেলার কোন তাৎপর্যগত পার্থক্য আছে বলে কি আপনি মনে করেন?

লুৎফর রহমান রিটন: প্রকৃতপক্ষে, কলকাতার বইমেলা জানুয়ারীতে অনুষ্ঠিত হয় আর সেটা ফেব্রুয়ারীর কিছুদিন পর্যন্ত চলে। ভাষাগত মিল থাকার কারনে দুটি দেশের বইমেলায় বেশ আড়ম্বরভাবে উদযাপিত হয়। কলকাতার বইমেলায় বাংলাদেশের প্রকাশনীর বই স্থান পেলেও অমর একুশে বইমেলায় কলকাতার কোন প্রকাশনীর বই স্থান পায় না। যার কারনে আমরা তাদের বই পড়ার সুযোগ পাইনা তখন। তবে আমাদের দেশেও প্রতিবছর একবার আর্ন্তজাতিক বইমেলা উদযাপিত হয়। সেখানে তাদের প্রকাশনীর বইও এখানে আসে।

শৈলী প্রতিবেদক: বর্তমানে আমরা জানি যে, ব্লগ মাধ্যমটি বাংলাদেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান করে নিয়েছে সাহিত্যসৃষ্টিতে। তো এ ব্যাপারে আপনার কাছে কিছু জানতে চাই।

লুৎফর রহমান রিটন: আমি অত্যন্ত আশাবাদী এই মাধ্যমটি নিয়ে। আমি দেখেছি শৈলী প্রথম সাহিত্য বিষয়ক একটি ব্লগ। এখানে অনেক তরুণরাই লিখছেন। আমি আগেই বলেছি নতুন লেখকদের জন্য এই ব্লগ মাধ্যমটি একটা অভাবনীয় সুযোগের দ্বার খুলে দিয়েছে। নতুনরা এখানে লিখতে পারতেছেন বিনা টাকায়। প্রকাশকের কাছে তাদের যাওয়ার প্রয়োজন পড়ছে না। সহজেই তা পাঠকমহলে প্রকাশ করতে পারছে। আমি মনে করি, এই মাধ্যমটি থেকেই আগামীতে ভালো সংখ্যক লেখক সৃষ্টি হবে। শুধু আমি একটা জিনিসই বলব, এই লেখকরা যেন প্রচুর পড়াশোনা করেন, গুনগতমান রক্ষা করে রচনা লিখেন, এটাই আমার তাদের কাছে চাওয়া।

বইমেলায়...

সাক্ষাতকার

শৈলী প্রতিবেদক: আমার শেষ প্রশ্ন, আপনি জানেন যে, শৈলী বাংলাদেশের প্রথম শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ক একমাত্র ব্লগ। তো আপনি শৈলী লেখক এবং পাঠকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন?

লুৎফর রহমান রিটন: আমি অত্যন্ত খুশি যে, শৈলী বাংলাদেশের প্রথম শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ক একমাত্র ব্লগ। এবং আমি এও জানি এই ব্লগ মাধ্যমটি থেকেই একদিন বেরিয়ে আসবে বাংলাদেশের অনেক যোগ্য লেখক, যোগ্য কবি সাহিত্যিকরা। শৈলীর প্রত্যেক লেখকদের জন্য থাকবে আমার আত্মিক ভালোবাসা। এখানে দেখেছি অনেক লেখকই খুব ভালো ভালো লিখছেন। তাদের প্রতি আমার অনেক অনেক শুভকামনা। তাদের মধ্য দিয়েই হযতো আমার পাবো অনেক ভালো ভালো সাহিত্য, কবিতা। এ আশা আমি ব্যক্ত করি। শৈলীর পাঠকদের উদ্দেশ্যেও বলব, আপনার নিযমিত ভালো ভালো রচনা পড়বেন, লেখকদের উৎসাহ দিবেন। এভাবেই বেরিয়ে আসবে আগামী দিনের লেখক সাহিত্যিক। শৈলী এগিয়ে যাক সামনের দিকে। পরিশেষে আবারও আমার পক্ষ থেকে শৈলীর পাঠকদের শুভেচ্ছা আর ভালোবাসা।

শৈলী প্রতিবেদক: ধন্যবাদ আপনাকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। শুভরাত্রি।

লুৎফর রহমান রিটন: আপনাকেও অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাকে শৈলীর লেখক-পাঠক মিলনমেলায় কিছু কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য। শৈলীর প্রতি শুভকামনা থাকবে সমসময়। শুভরাত্রি।

ছোটগল্প

বাবা, অন্তু হারিয়ে গেছে

শৈলার মাহাবুবুল হাসান নীরু

'ভেঙেই তো গেছি তুতুলি,' অন্তুর কক্তে চরম হতাশা, 'পড়তে আর কিছু বাকি রয়েছে কি?' কথা বলতে পারেনি আর তুতুলি। যৌবন জোয়ারী শরীর, চোখে রঙিন চশমা। সুপুষ্ট, মসৃণ, লাস্যময়। মন জুড়ে কামনার ঝড়ের ক্ষ্যাপা তাণ্ডব।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না তুতুলি। যার জন্য এতো অপেক্ষা, যার প্রতীক্ষায় এতো প্রহর গোনা, ওর সেই স্বপ্নের পুরুষটি হেঁটে যাচ্ছে নীলক্ষেতের ফুটপাত ধরে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না তুতুলি। আবেগে কেঁপে ওঠে ওর দেহ-মন।

ও নিজের অজান্তেই হাত তুলে গলা ছেড়ে চিৎকার করে ওঠে প্রিয় মানুষটার নাম ধরে। কিন্তু দূরত্ব অনেক। জনকোলাহল ছাপিয়ে, দূরত্ব ডিঙ্গিয়ে সে চিৎকার পৌঁছুলো না তার কানে।

নিউ মার্কেট থেকে বেরিয়ে বাসায় ফেরার জন্য রিকশা ঠিক করছিলো তুতুলি, এ সময় ওর চোখ পড়লো রাস্তার ওপাড়ে ফুটপাতে পথচারীর ভিড়ে আরাধ্য মুখটার ওপর। রাস্তায় গিজগিজ করছে রিকশা, টেম্পো, মিনিবাস। সহসা রাস্তা পেরুনোর উপায় নেই। অথচ ওর আরাধ্য মুখটা দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে জনস্রোতে, চলে যাচ্ছে চোখের আড়ালে। ছটফট করছে তুতুলির তৃষ্ণার্ত, অস্থির মন। অনেক চেষ্টা করে তুতুলি যখন রাস্তা পেরুতে সমর্থ হলো তখন প্রিয় মুখটা হারিয়ে গেছে নীলক্ষেতের মোড়ে। পাগলের মতো খুঁজলো। ছুটোছুটি করলো। অবশেষে নিষ্ফল হলো। বুক ঠেলে উঠে এলো বাঁধভাঙ্গা কান্না। ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো সে। তারপরও তুতুলির প্লাবিত চোখ চলমান জনস্রোতে খুঁজে ফেরে প্রিয় মুখটি। যদি দেখা মিলে যায়। অকস্মাৎ যদি ফের খুঁজে পায়। ওর ভেজা মুখখানার ওপর প্রশ্নবোধক দৃষ্টি ফেলে ফুটপাতে বয়ে চলে ব্যস্ত মানুষের ঢল। সময়ের পথ ধরে সময় গড়ায়, শেকল ছেঁড়া সেই পাখিটা নজরে আসে না ব্যাকুল প্রতীক্ষার পরও।

এতো কাছে পেয়েও মানুষটাকে হারিয়ে ফেললো সে। বছরের পর বছর ধরে অপেক্ষায় প্রহর গুনছে কিন্তু আজ চোখের দেখা দেখলো শুধু, সেও বেশ দূরত্বের ব্যবধানে। কিছুটা সময়ের জন্য। হতে পারলো না মুখোমুখি। ছুঁতে পারলো না। বলতে পারলো না একটি মাত্র কথা, 'কেন তুমি এভাবে নিজেকে আড়াল করে রেখেছো অন্তু?' বুকটা ওর দুমড়ে মুচড়ে একাকার হয়ে যায়। চৈত্রের খর দুপুরের রাখালের বাঁশির করুণ বিচ্ছেদের সুর ওর নরম কলিজা এঁফোড়-ওফোঁড় করে। স্মৃতির জানালায় আছড়ে পড়ে কুন্ডলি পাকানো একটা ধূলিঝড়। বড় জ্বালা। বড় যন্ত্রণা। অসহ্য! নিজের তপ্ত মাথাটা দু'হাতে চেপে ধরে তুতুলি। কোনো রকমে একটা রিকশা ঠিক করে উঠে পড়ে তাতে। যানজট ঠেলে রিকশা চলে। ধীরে। মাঝবয়সী রিকশাওয়ালা বলে, 'বুঝলেন আফা, মনে শান্তি নাই, ছয় টাকার খ্যাপ মারতে দিন কাবার। রাস্তার জাম আমাগো জান লইয়া টানাটানি শুরু করছে। বাঁচতে পারমু নাগো আফা।'

রিকশাওয়ালার কথাগুলো তুতুলির কানে গেলো না। ওর কানে বাজছে অন্তর সেদিনের সেই কথাগুলো, 'তুতুলি, বই-পুস্তকে পড়েছি মানুষের অসাধ্য বলে কিছু নেই, কিন্তু তুতুলি, আমি এমন একটা জীবন নিয়ে জন্মেছি যার সাধ আছে, সাধ্য নেই। স্বপ্ন আছে, প্রাপ্তি নেই। তুমি বর্ণিল, আমি বিবর্ণ। তুমি সতেজ, আমি বিধ্বস্ত। তুমি চলমান, আমি অথর্ব।'

তুতুলি বলেছে, 'এতো সহজে হতাশ হয়ে পড়ছো কেনো অন্তু, ধৈর্য ধরো, দেখো নিশ্চয় জীবনটা পাল্টে যাবে।'

'আর কবে পাল্টাবে তুতুলি! আর কতো ধৈর্যধারণ করবো? মেঘে মেঘে বেলা তো আর কম হলো না। বেকারত্বের অভিশাপ যে কতো দুর্বিষহ সে তুমি বুঝবে না। মেস ভাড়া দেয়ার সামর্থ্য পর্যন্ত আজ আমা হতে লুপ্ত। লেখাপড়ার শেষ ধাপ ডিঙ্গিয়েছি সেও তিন বছর হয়ে গেলো। না তুতুলি, আমি আর পারছি না। আমাকে তুমি ক্ষমা করো।' অন্তর কথায় বুকটা কেঁপে উঠেছে তুতুলির। সে অন্তর মনে সাহস যোগানোর চেষ্টা করেছিলো, 'ভেঙে পড়ো না অন্তু।'

'ভেঙেই তো গেছি তুতুলি,' অন্তর কক্তে চরম হতাশা, 'পড়তে আর কিছু বাকি রয়েছে কি?'

কথা বলতে পারেনি আর তুতুলি। যৌবন জোয়ারী শরীর, চোখে রঙিন চশমা। সুপুষ্ট, মসৃণ, লাস্যময়। মন জুড়ে কামনার ঝড়ের ক্ষ্যাপা তাণ্ডব।

অদৃষ্টের হাতে নিজেদের সঁপে দিতে চেয়েছিলো তুতুলি। আকাশ, বাতাস, চন্দ্র, সূর্যকে সাক্ষী রেখে জীবনের সাথে কঠিন বন্ধনে বাঁধতে চেয়েছিলো অন্তুকে। কিন্তু অন্তু অনড়। নিরেট, শক্ত পাথর। আকাশের দিকে তাকিয়ে ওর মন ভরে না, বাতাস গিলে ভরে না পেট। লক্ষ লক্ষ মাইল দূরের চন্দ্র আর সূর্যকে সাক্ষী মানতে নারাজ সে। কঠিন বাস্তবতার নির্মম কষাঘাতে রঙিন চশমা চোখে তোলার ফুরসৎ পায়নি সে কখনো। আর তাই বুঝি তুতুলির ভরা শরীরের অতি স্পষ্ট রেখাগুলো নজর কাড়তে পারেনি অন্তুর। তুতুলির দু'চোখে আহ্বান ছিলো, দু'ঠোঁটে কামনা, ওর আলোক উদ্ভাসিত বুকের ছন্দ, সৌরভ অন্তুর বিবর্ণ জমিনে ঘটাতে পারেনি সবুজের সমাহার। তুতুলি যতোই ঘেঁষতে চেয়েছে অন্তু ততোই ছিটকে সরে গেছে।

তুতুলি জানতে চেয়েছে, 'জীবনকে কেন এতো ভয় পাও অন্তু?'

শৈলার: মাহাবুবুল হাসান নীরু

লেখক, সাংবাদিক, পাক্ষিক ক্রীড়ালোক এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক এবং সাপ্তাহিক রোববারের প্রাক্তন নির্বাহী সম্পাদক। মাহাবুবুল হাসান নীরুর সাংবাদিকতার বয়স বিশ বছর হলেও লেখালেখির জগতে আছেন দুই যুগ ধরে। সাংবাদিক হিসেবে পেশাগত জীবন শুরুর আরো আগে থেকে দেশসেরা সব পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি শুরু। ১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক বাংলা (অধুনালুপ্ত), সাপ্তাহিক বিচিত্রা (অধুনালুপ্ত), দৈনিক বাংলার বানী (অধুনালুপ্ত), দৈনিক ইনকিলাব, সাপ্তাহিক পূর্বাণী (অধুনালুপ্ত), সাপ্তাহিক চিত্রালীসহ দেশের শীর্ষস্থানীয় পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রায় অর্ধশত লেখা প্রকাশিত হয়।

অন্তু হেসেছে। ম্লান সে হাসি। শুষ্ক কণ্ঠে বলেছে, 'আমার জীবনকে আমি ভয় পাই না তুতুলি। ভয় তোমার জীবনটাকে নিয়ে। আমার পোড়া, নিরস, বিরস জমিনে এসে তুমি বিবর্ণ হবে, বিধ্বস্ত হবে, তোমার চোখের রঙিন চশমাটা খুলে পড়ে খান খান হয়ে ভেঙে যাবে, মোহভঙ্গে তুমি আমাকে একটা জানোয়ার ভাববে, তার চে' এই কি ভালো না তুতুলি, বেঁচে থাকবে আজকের দিনগুলো পরম ভালো লাগার দিন হয়ে?'

অন্তুর কথাগুলো শুনে রক্ত উঠে যায় তুতুলির মাথায়। ও চিৎকার করে ওঠে, 'তুমি একটা কাপুরুষ।' তুতুলির ধিক্কারে বীরপুরুষ হতে পারেনি অন্তু। মন ধারণ করেনি ক্ষ্যাপা ব্যাঘ্রের রূপ। অথবা কামনার ডানায় জাপটে ধরে তুতুলিকে নিয়ে রাজহাঁসের মতো আছড়ে পড়েনি কল্পিত রঙিন সরোবরে। বড় ব্যথা পেলো তুতুলি। বড্ড রাগ হলো। উধাও হলো ওর মনোজগতে জোৎস্নার প্লাবন। রাগে-দুঃখে সে অন্তুকে গলা চড়িয়ে বললো, 'এমন কাপুরুষ তুমি, জানলে তোমার ভিটেও মাড়াতাম না।'

অন্তু রাগেনি। চটেনি। ফুঁসে ওঠেনি। হেসেছে। ম্লান সে হাসি। বলেছে, 'আজ তুমি আমাকে অনেক কিছুই ভাবতে পারো তুতুলি, অনেক কথা বলতে পারো। বিশ্বাস করো কঠিন বাস্তবতা তিল তিল করে শুষে নিয়েছে আমার সমস্ত পৌরুষ, অবশিষ্ট আছে শুধু উরুর সন্ধিস্থলের বর্ধিত মাংসপিন্ডটা। এখন ওটার অস্তিত্ব অনুভব করতেও আমার ঘেন্না হয়।' এক সময় অন্তুর কণ্ঠটা বেদনার্ত হয়, 'আমার এক শরীরের ভারই আমি বইতে পারছি না তুতুলি, এরপর তোমার শরীর। তারপর দুই শরীরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে আরও শরীর, এক, হতে পারে একাধিক।'

ফুঁসে ওঠে তুতুলি, 'ভাবনার কোনো গন্তব্য নেই, যতোই ভাববে ভাবনার পরিধি ততোই বাড়বে, মহাশূন্যের মতো। শেষ নেই। অমন ভাবনা তুমি বসে বসে ভাবো। আমার দুঃখ তোমার মতো একটা নির্জীবকে আমি আমার জীবন ভেবেছিলাম।'

অন্তু কোনো উত্তর দেয়নি। দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে মাত্র। হতাশার ফ্যাকাশে চোখ মেলে আকাশ দেখেছে। আর অন্তুর মুখের উপর সাফ জবাব দিয়েছে তুতুলি, 'এই শেষ। আর নয়। মরা পুরুষের সাথে তো আর ঘর বাঁধা যায় না।'

অন্তু দেখলো তুতুলির নাকের পাটা ফুলে গেছে, গরম নিঃশ্বাস বইছে। চোখে ঝরছে আগুন। ভস্ম করে দিতে চাইছে অন্তুকে। এক সময় তুতুলি অন্তুকে দেখালো পশ্চাদদেশ। পিছন ফিরে চাইলো না একটিবারও। শুধু ওর কানে ভেসে এলো অন্তুর শেষ কথাগুলো, 'তোমার আমার প্রেমের সুধামাখা দিনগুলো আমার পরম পাওয়া, যতোদিন বেঁচে থাকবো বুকে লালন করবো পরম যতেœর সাথে।'

সেই শেষ কথা। শেষ দেখা। আর কখনো, কোনোদিন তুতুলি অন্তুর দেখা পায়নি। দেখা দেয়নি অন্তু। অন্তুকে রাগের বশে অনেক কথা বললেও অন্তুর বিচ্ছেদ ওকে বিরহের দাবানলে নিক্ষেপ করলো। প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ জ্বলতে লাগলো তুতুলি। যতোই জ্বলে শরীরের জ্বালা ততোই কমে যায়, চোখের রঙিন চশমাটা হালকা হতে হতে এক সময় খসে পড়ে। মাত্র ক'দিনের ব্যবধানে একটা অসম্ভব দৃঢ়তা নিয়ে বাবার মুখোমুখি হয় সে। প্রত্যয়ী কণ্ঠে বলে, বাবা, আমি পড়াশোনা করবো, ভার্সিটিতে ভর্তি হবো।'

মেয়ের কথায় বেশ খুশি হলেন আবদুল হাফিজ। ভার্সিটিতে ভর্তি করে দিলেন তিনি তুতুলিকে। শুরু হলো তুতুলির নতুন জীবন। আরাধনার জীবন। আসলে তুতুলির পতিত শিক্ষা জীবনে নব উদ্যমের বীজ বপিত হয়েছে অন্তুর কারণেই। রাগে-দুঃখে অন্তুকে তিরস্কার করে ফিরে এলে নতুন ভাবনা পেয়ে বসলো তুতুলিকে। ওর মনে হলো, আজ যদি সে শিক্ষিত হতো, উপার্জনক্ষম হতো তবে অনায়াসেই সে অন্তুর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলতে পারতো, 'তুমি বিধ্বস্ত, তাতে কি, আমি তো পূর্ণ। উঠে এসো আশাহত পথিক আমার হাত ধরে, আজ আমার আছে, একদিন তোমারও হবে। দু'জনে যৌথ প্রচেষ্টায় গড়বো সুরম্য নগরী।' কিন্তু তুতুলির যা শিক্ষা তাতে অন্তুর জীবনে বোঝা হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিলো না। পূর্ণ জোয়ারী যৌবনের কামনা বাসনা মনের সকল কপাট বন্ধ করে রেখেছিল। টানাটানির সংসার ওদের।

চার ভাই বোন। বাবার আয়ে কোনো রকমে চলে যায়। এরই মাঝে দ্বিতীয় বিভাগে আইএ পাস করার পর তুতুলি ঘোষণা দিলো সে আর লেখাপড়া করবে না। কিন্তু আবদুল হাফিজের বড় ইচ্ছে, লেখাপড়া করে ছেলেমেয়েগুলো মানুষের মতো মানুষ হোক। যে করেই হোক কষ্টেশিষ্টে চালিয়ে নেবেন তিনি। মেয়েকে অনেক বোঝালেন। তুতুলির এক কথা সে আর পড়াশোনা করবে না। তুতুলির শরীর জুড়ে ভরা পূর্ণিমার প্লাবন। নানা বর্ণের বাহারি ফুলে ভরপুর মনের বাগান। চোখ বুঁজলেই পৌঁছে যায় সুখনগরে। ঘাড়ের ওপর অনুভব করে পিয়াসি যুবকের ঘন, ভারি নিঃশ্বাস। শরীরের কূলে কূলে মোচড় খায় পরিচ্ছন্ন যৌবন। কখনো বা প্রবলভাবে।
জাহাজডুবি যাত্রী অথৈ সাগরে বাঁচার আশায় আঁকড়ে ধরে সামান্য কাঠের টুকরোটাকেও। যদিও জানে এটা যথেষ্ট নয়, তবু আপ্রাণ চেষ্টা বেঁচে থাকার। অন্ধ যৌবনের কামনা বাসনা অনুরূপ। কাউকে মনে ধরলে কাছে টেনে তাকে পিষে ফেলতে চায় অরুদ্ধ আবেগ। তখন মনে হয় সেই হচ্ছে জীবনের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। মনের আকাশে ওড়ে রঙিন কাগজের ঘুড়ি, ত্বকে কামনার শিশির জ্বল জ্বল করে নব্য যৌবনের আলোকে। কামুক বাঘিনী পেলো ব্যাঘ্রের সন্ধান। তুতুলির আহ্বানে সাড়া দিলো অন্তু, দু'জনের মধ্যে বয়সের একটা বড় ব্যবধান সত্ত্বেও।

অন্তু পাস করে চাকরির জন্য ঘুরছে। অভাবী জীবন। দরিদ্র কৃষক বাবার অর্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের গন্ডি পেরিয়েছে কিন্তু চাকরি মেলেনি। একদিন তুতুলির রঙিন চশমায় আটকে গেলো অন্তু। থাক অভাব, তাক দারিদ্র্য তথাপি অন্তু মানুষ। বেদনার আস্তরণ সরিয়ে তুতুলি অন্তুর মনে জাগাতে চাইলো নেশা। ভালোবাসা, ভালোলাগার নেশা। রূপের নেশা, রঙের নেশা। কামনা, বাসনা। নাড়া পেয়ে সাড়া দিলো অন্তু। তুতুলির খোলাচুলে খুঁজে পেলো জীবনের সৌরভ। কিন্তু বাস্তবতার ভোঁতা আর চোখা গুঁতোগুতিতে ক্ষতবিক্ষত অন্তু সর্বদা ছিলো সচেতন। তুতুলির জালে ধরা পড়লেও, ক্ষ্যাপা যৌবনের নেশায় মাতাল হয়ে ওঠেনি কখনো। তুতুলিকে সে অনেকভাবে বুঝিয়েছে নিজের হতদরিদ্র জীবনের কথা। তুতুলি কানে তোলেনি সেসব। পরিণতিতে একদিন বিচ্ছেদ।

মেঘে মেঘে গড়িয়েছে বেলা। সূর্য ডুবেছে, আবার উদিত হয়েছে। দিনে দিনে মাস, মাসে মাসে বছর। একে একে গড়ালো পাঁচটি বছর। গভীর আত্মবিশ্বাস আর দৃঢ় প্রত্যয়ে বেশ কৃতিত্বের সাথেই তুতুলি শেষ করলো ওর শিক্ষা জীবন। পৈতৃক সূত্রে পিতার কর্মস্থলে একটা চাকরিও মিলে গেলো। আয় রোজগার মন্দ নয়। নিজেকে অনেক সাধ্য সাধনায় শক্তভাবে দাঁড় করানোর পাশাপাশি তুতুলি একদিনের জন্যও ভুলে গেলো না অন্তুকে। অর্ন্তজ্বালায় নিশিদিন জ্বলে তুতুলি। পথে ঘাটে যেখানেই যায় অনুসন্ধানী দৃষ্টিযুগল খুঁজে ফেরে অভিমানী প্রিয় মানুষটাকে। কিন্তু দেখা পায় না।

তুতুলি অন্তুকে সেদিন রাগের মাথায় কাপুরুষ বললেও সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে অন্তুর বলিষ্ঠ পৌরুষকে। অন্তুর মতো পুরুষকে আজ সে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। অন্তুর মতো ছেলেরা গড্ডালিকাপ্রবাহে নিজেদের ভাসিয়ে দেয় না। ওদের আত্মসম্মানবোধ দারুণ স্বচ্ছ আর প্রবল। তুতুলি মনে করে আজ আমাদের সমাজে অন্তুর মতো ছেলেরা অবহেলিত না হলে, তাদের যথাযথ মূল্যায়ন হলে দেশ ও জাতি অধিক উপকৃত হতো। কিন্তু অনাদর, অবহেলা, লাঞ্ছনা-বঞ্চনায় নিখাঁদ সোনায় প্রতিনিয়ত খাঁদ জমছে। তুতুলি জানে না অন্তু এখন কতোটুকু 'অন্তু' আছে। কোথায় আছে, কেমন আছে।

ভাবনার সাগরে ভাসতে ভাসতে বাসায় ফিরলো তুতুলি। শূন্য মনে বেদনার স্তূপ। নতুন করে বিচ্ছেদ যন্ত্রণা ওকে কুরে কুরে খেতে লাগলো।

তুতুলি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে চাকরিতে যোগ দেবার পর থেকে বাবা আবদুল হাফিজ ওর বিয়ের জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন। তারা জানেন অন্তুর কথা। এ সম্পর্কে আবদুল হাফিজের মতামত হচ্ছে, 'এতো বছর যখন ছেলেটা এলো না কিংবা একবারও খোঁজ নিলো না তখন ওর জন্য আর অপেক্ষা করার কোনো মানে হয় না।' আবদুল হাফিজ মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে প্রায়ই বলেন, 'মা, এতোই তো খোঁজাখুঁজি করছিস, কই তার তো দেখা মিলছে না, ওর জন্য নিজের জীবনটা কেন নষ্ট করছিস মা।'

তুতুলি বাবার এমন কথায় প্রতিবাদ করে ওঠে, 'না বাবা, ওর জন্যই আমি জীবনকে নতুন করে গড়তে পেরেছি, নিজের পায়ে শক্ত করে দাঁড়াতে পেরেছি। নারী হলেও এখন আর আমি দুর্বল নই।' 'তোর সব কথাই ঠিক আছে মা,' আবদুল হাফিজ কণ্ঠে আদর ঝরিয়ে বলেন, 'বয়সের একটা ব্যাপার আছেরে মা। দিনে দিনে তোর বয়স তো আর কম হলো না, সেই সাথে আমারও। কবে যে চলে যাই কে জানে। তোর বিয়েটা না দেয়া পর্যন্ত এ বুড়োর শান্তি নেই। রাত-দিন এই একটা যন্ত্রণা প্রবলভাবে ক্ষতবিক্ষত করে আমাকে আর তোর মাকে।'

কোনো কথা বলেনি তুতুলি। আবদুল হাফিজ আরো অনেক কথা বলেন। ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবাহযোগ্য মেয়ে ঘরে রাখলে কতোটা পাপ হয় ও আখেরাতে এর জন্য সৃষ্টিকর্তার কাছে কি ধরনের জবাবদিহি করতে হবে এবং এ পাপের জন্য দোজখের আগুনে কতো হাজার বছর জ্বলতে হবে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেন। কিন্তু এতোসব কথা কানে যায় না তুতুলির। ওর মন প্রতীক্ষায় প্রহর গুনে অন্তর জন্য। ওর দু'চোখ সর্বক্ষণ খুঁজে ফেরে অন্তকে। সেই আকাঙ্ক্ষিত অন্তকে আজ চোখের দেখা দেখেও হারালো তুতুলি। মাঝখানে অনেকগুলো বছর অতিক্রান্ত হলেও অন্তকে চিনতে একটুও কষ্ট হয়নি ওর। মুখবয়বে শুষ্কতার ছাপ এখনো বিদ্যমান। তুতুলি ভাবে শুধু একবার যদি অন্তর মুখোমুখি হতে পারতো সে তবে বলতো, 'আজ বাবার বলে নয় নিজের শক্তিতে আমি চলমান। আজ শুধু আমার শরীর নয়, তোমার শরীরও বহন করার যোগ্যতা অর্জন করেছি আমি, শরীরে শরীর মিশে আরও শরীর এলে সেটিকেও বহন করতে এখন আমি সক্ষম।' কিন্তু হায়, তুতুলি যেদিকেই সে চায়, অন্ত নেই, পায় না অন্তর সন্ধান।

বাসায় ফিরে বালিশে মুখ গুঁজে অনেকক্ষণ কাঁদলো। অঝোর ধারায়। এক সময় পিঠে স্নেহের পরশ পেয়ে মুখ তুলে তাকিয়ে তুতুলি দেখলো বাবা আবদুল হাফিজ এবং মা মিনারা হাফিজ দু'জনেই দাঁড়িয়ে আছেন ওর সামনে। মিনারা হাফিজ এগিয়ে এসে খাটের ওপর বসে মেয়ের মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে হাত বুলোতে লাগলেন।

ভারী কণ্ঠে আবদুল হাফিজ প্রশ্ন করলেন, 'এভাবে কাঁদছিস কেন মা?'

তুতুলি শুষ্ক কণ্ঠে উত্তর দিলো, 'বাবা, আজ নীলক্ষেতে আমি অন্তকে দেখেছি কিন্তু ওর মুখোমুখি হতে পারিনি, তার আগেই হারিয়ে গেছে ভিড়ের মধ্যে।'

আবদুল হাফিজ চেয়ারটা টেনে বসলেন, বললেন, 'এ তোর দেখার ভুলও হতে পারে মা।'

তুতুলি প্রবলভাবে দু'দিকে মাথা নাড়ে, 'না বাবা, এতোটুকু ভুল হয়নি।'

আবদুল হাফিজ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, 'এতোগুলো বছর অপেক্ষা করে যাকে শুধু চোখের দেখা দেখলি আরও কতোগুলো বছর অপেক্ষা করে যে তার মুখোমুখি হতে পারবি সে খোদা জানে।' বাবার হৃদয়ের রক্তক্ষরণের শব্দ কানে বাজলো তুতুলির। ও ফ্যাকাশে দৃষ্টিতে তাকায় বাবার দিকে। আবদুল হাফিজ উঠে এসে মেয়ের পাশে বসলেন। স্ত্রীর কোল থেকে মেয়ের মাথাটা নিজের কোলে টেনে নিয়ে, মাথায় হাতে বুলোতে বুলোত আর্দ্র কণ্ঠে বললেন, 'মা তুতুলি, তোর বুড়ো বাবা মা যে আজ বড় একটা অন্যায় করে ফেলেছেরে মা।'

বাবার এমন নরম আর মধুর কক্ত তুতুলির আবেগে ঝড় তোলে। মমত্বভরা চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে সে বলে, 'কি অন্যায় বাবা?'

আবদুল হাফিজ তাকালেন স্ত্রীর দিকে। মিনারা হাফিজ মেয়ের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'তোর জীবনটা আমরা এভাবে নষ্ট হতে দিতে পারিনারে মা। আমরা তোর বিয়ে ঠিক করেছি। খুব ভালো ছেলে। একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে ভালো চাকরি করে। স্বল্পভাষী। স্বভাবে ধীরস্থির। বড় লক্ষ্মী ছেলে। তুই সুখী হবিরে মা।...

তুতুলি একবার বাবার দিকে, একবার মায়ের মুখের দিকে তাকালো, তারপর বালিশে মুখ গুঁজে আবার হু হু করে কাঁদতে লাগলো।

কবিতা

শৈলার মলয় রায়চৌধুরী

অভ্রপুষ্প

মলয় রায়চৌধুরীর (জন্ম ২৯ অক্টোবর, ১৯৩৯) অনেক পরিচয় আছে। তিনি কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, অনুবাদক। কিন্তু এখনও তাঁর সবচেয়ে বড়ো পরিচয় তিনি ষাটের দশকের সেই বিখ্যাত হাংরি আন্দোলনের পুরোধা পুরুষ। তখন, এবং এখন, সাহিত্যের কোনো অনুশাসন তিনি কখনও মানতে চাননি। সে ষাটের হাংরি আন্দোলন হোক বা শতকশেষের অধুনান্তিক চিন্তা। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'শয়তানের মুখ' (কৃত্তিবাস প্রকাশনী, ১৯৬৩) থেকেই মলয় রায়চৌধুরী আজ পর্যন্ত বাংলা কবিতার এক জলবিভাজক ব্যক্তিত্ব। কবিতায় যে-কোনো নিয়মানুবর্তিতা ও আনুগত্যকে মলয় চিরকাল নাকচ করেছেন।

মোচড়খোলা আলোয় আকাশকে এক জায়গায় জড়ো করে
ফড়িং-ফোসলানো মুসুরিক্ষেতে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন বোলডার-
নিতম্ব কবি।

মরাবাতাসের বদবুমাখা কণ্ঠস্বরে ঝরছিল বঁড়শিকেঁচোর
কয়েলখোলা, গান থেকে এক-সিটিঙে সূর্যের যতখানি
রোজগার।

শেষ হয়ে যায় মধু দিয়ে সেলাই করা মৌচাকে মোতায়েন
জেড ক্যাটাগরির, ভোঁদড়ের খলিফা-আত্মা সামলাতে।

প্রদূষণ বিরোধীদের দিকে ছোঁড়া কাঁদানে গ্যাসের হাসি চুয়ে
পড়ছিল, লিপস্টিক-বোলানো গোধূলি থেকে চুলকুনি-জালে
বানানো চামড়ায়

ভুটভুটির মাঝি-মেকানিক তখন ফ্রিজের কুমড়োর শীতঘুম
থেকে উঠে, দু-চার ক্রেট নদী ভরেছে ডতপেনের নীল
শিরদাঁড়ায়।

যার ফলে আঙুলের ডগায় লেগে থাকা স্মৃতিতে খুঁজে পাওয়া
গেছে, হারানো চাবির বিকল্প এক আয়ুর্বেদিক জ্যোৎস্না।

মাথার ওপর বয়ে নিয়ে চলেছে বোরখা-ঢাকা মেঘের মধ্যে
পালক-খোলা টিয়াদের জোয়ারে হেলান-দেয়া গেঁহুয়াপিঠ
ঢেউ।

ছোট গল্প

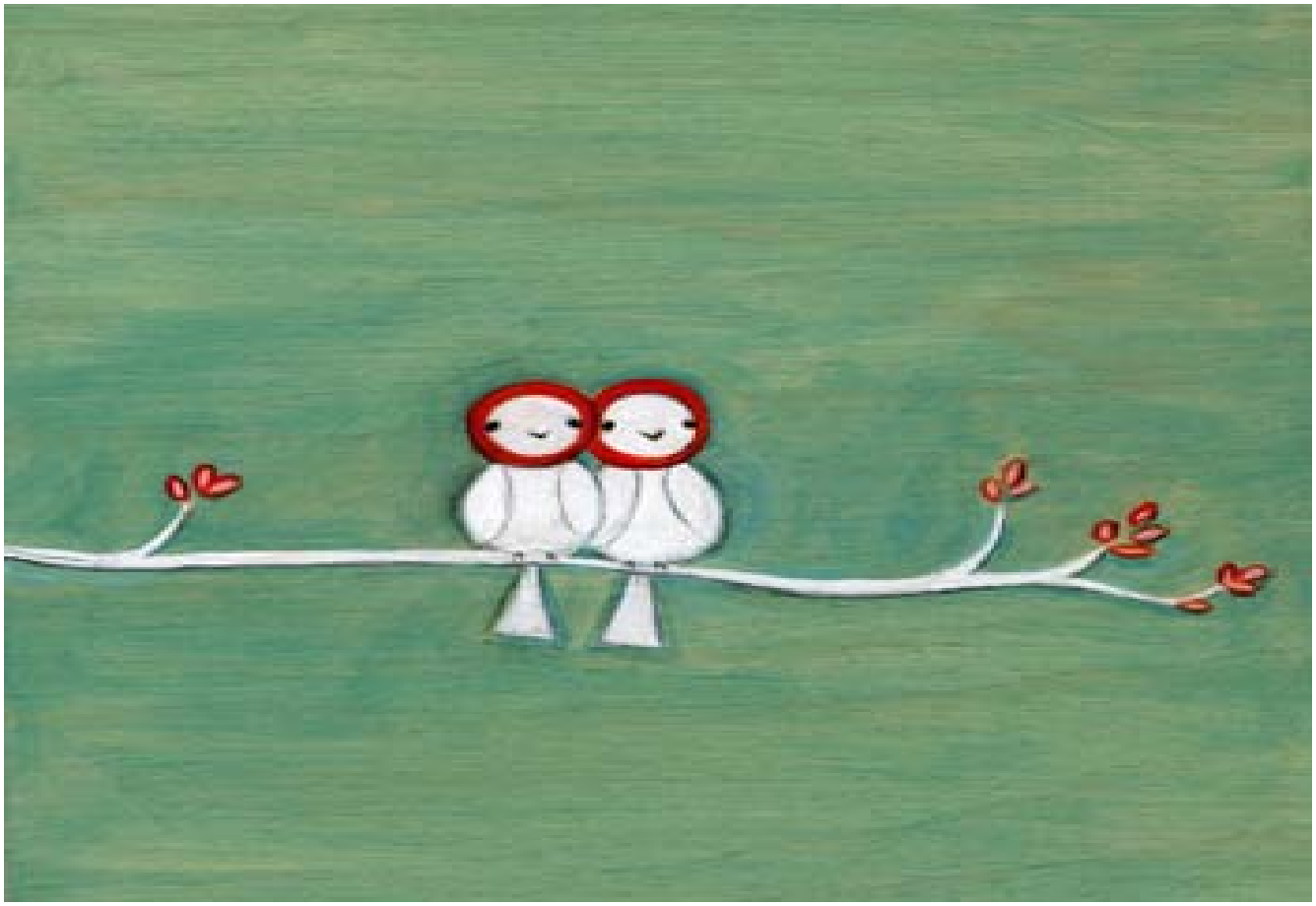

একটি প্রেমের গল্প: গ্রীনজোরি

শৈলার কুলদা রায়

.....রাজার সেনাবাহিনীর ক্যাপটেন। যুবক। সুদর্শন। প্রাণবন্ত। টগবগে ঘোড়ায় চড়া ক্যাপটেন মেয়েদের ভালবাসায় প্লুত। ভালবাসা পেতে তার কোনো ঝামেলা নেই। তার চাই শুধু ভালবাসা। হাত বাড়ালেই যে ভালবাসা পাওয়া যায়।.....

১.

আমি গ্রীনজোরিকে ভালবাসি। গ্রীনজোরি আমাকে।

কলেজে পড়ার শুরুতেই গ্রীনজোরির সঙ্গে দেখা মেলে। এক সঙ্গে তিনজন–পুরো অমনিবাস। হান্স ব্যাক অব নতরদাম, বাগ জার্গল এবং নাইনটি থ্রি। বাবা বলল, দ্যাখ–পড়ে দ্যাখ।

বইটি বেশ মোটা। শুরু হয়েছে একটি উৎসবের প্রস্তুতির বর্ণনা দিয়ে। দীর্ঘ বর্ণনা। টেনে নিয়ে গেল সেই ফরাসী দেশে। সেখানে দেখতে পাচ্ছি লা এসমারেল্ডা নামের এক জিপসী মেয়েকে। অপরূপ সুন্দরী। ঘাগরা পরে রাস্তায় নাচছে। হাতে তানপুরা। সহ নৃত্যশিল্পী জালি নামের এক ছাগল। জিপসী মেয়েটির নাচ দেখে পাগল হয়েছে নতরদাম চার্চের ব্রহ্মচারী পাদরী জাঁ ক্লদ, একজন ক্যাপটেন, কুঁজো এতিম গির্জার ঘণ্টাবাদক কোয়াসিমোদো এবং কবি ও দার্শনিক গ্রীনজোরি।

এসমারেল্ডা নতরদাম থেকে একটু দূরে ভবঘুরে পল্লীতে থাকে। এই ভবঘুরেরা হল চোর, মাতাল, খুনে, অভাবী, দাগী অপরাধী। তারা এই মেয়েটিকে তাদের হৃদয়ের বোন বলে জানে।

গ্রীনজোরির সঙ্গে মেয়েটির বিবাহ নামক একটি ঘটনা আছে।কাগজ কলমে। ঐ পর্যন্তই। তার বেশি কিছু নয়। গ্রীনজোরি তাকে ভালবাসে একজন কবির মতো করে–একজন দার্শনিকের মতো করে।স্বামীর মতো নয়। ছায়ার মতো তাকে পথে পথে আগলে রাখে।কিন্তু তাকে কখনো ভালবাসে নি এসমারেল্ডা। কবিকে করুণা করা ছাড়া কে কবে ভালবেসেছে?

এসমারেল্ডাকে ভালবেসেছে কুৎসিৎ দর্শন কোয়াসিমোদো। চার্চের ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে দেখেছে রাস্তায় নৃত্যরত এসমারেল্ডাকে। তাকে নিয়ে মাধুর্য্যমণ্ডিত স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু আবার চার্চের পুরোহিত জাঁ ক্লদের আশ্রিত কোয়াসিমোদো জানে দুঃস্বপ্নেও এই জিপসী মেয়েটির ভালবাসবে না। তার ভালবাসা পাওয়ার আশাও করে না। কিন্তু একাকী গন্ধবিধুর ধুপের মতো ভালবাসতে তো কোনো অসুবিধা নেই। তাই তাকে ভালবাসে কোয়াসিমোদো।

কুলদা রায়

প্রিয় বাণী:
ধর্মের স্বাধীনতা চাই,
মর্মের স্বাধীনতা চাই...

আর তাকে ভালবাসে ক্ষ্যাপা ষণ্ডের মতো সেই চার্চের পাদরী ফরাসী দেশের ঈশ্বরপ্রায় জাঁ ক্লদ। এ ভালবাসা একতরফা। তার ভালবাসায় ক্ষমতার চূড়ান্ত জোর আছে। ভালবাসতে গিয়ে কুকুরের মতো পাগলা হয়ে ওঠে ব্রহ্মচারী। মেয়েটির কানে কানে বলে, বলো, বলো মেয়ে–তুমি আমাকে ভালবাসো। বলো, ভালবাসো আমাকে। বলতে বলতে জাঁ ক্লদের হেঁচকি ওঠে। বিকৃত হয়ে ওঠে মুখমণ্ডল। হিংস্র বাঘের মত তার নখদন্ত বেরিয়ে পড়ে।

এসমারেল্ডা কিন্তু ভালবাসে ক্যাপটেনকে। রাজার সেনাবাহিনীর ক্যাপটেন। যুবক। সুদর্শন। প্রাণবন্ত। টগবগে ঘোড়ায় চড়া ক্যাপটেন মেয়েদের ভালবাসায় প্লুত। ভালবাসা পেতে তার কোনো ঝামেলা নেই। তার চাই শুধু ভালবাসা। হাত বাড়ালেই যে ভালবাসা পাওয়া যায়। যে ভালবাসার জন্য কোনো কষ্ট করতে হয় না। যে ভালবাসা ছেড়ে যেতেও কোনো পাপবোধ জাগে না। এই অবাধ ভালবাসা ছাড়া আছে কি? সে বলে, ফুলের বনে যার কাছে যাই–তারেই লাগে ভাল, ও রজনীগন্ধা---তোমার গন্ধসূধা ঢালো। এসমারেল্ডা তার দেহমনের সমস্ত সুগন্ধিই নিবেদন করেছে ক্যাপটেনকে।ক্যাপটেন ছাড়া তার ভুবনে আর কেউ নেই।

জাঁ ক্লদ চার্চের পাদরী। অমিত ক্ষমতা তার। তার কথাই আইন। পবিত্রতার একটা রেশমী মুখোশ আছে তার মুখে, চোখে, কণ্ঠে। তার কথাই ঈশ্বরের কথা। এসমারেল্ডাকে তার চাই। তিনি বলেন– এই মেয়ে, তুমি যদি আমাকে তোমার ভালবাসা না দাও তাহলে তোমাকে শুলে চড়তে হবে। শুলে চড়ার প্রয়োজনীয় আয়োজনও তিনি করেছেন। শুলে চড়ার আগের মুহুর্তেও তিনি বলছেন মেয়েটির কানে কানে–হে মেয়ে,তুমি বলো–আমাকে ভালবাসো। যদি বলো–তাহলে তোমাকে আমি বাঁচাব। ডাইনীর বদলে তোমাকে দেবী বানিয়ে দেব।

সেই সমবেত জনতার সামনে, সেনা সামন্তদের সামনে, প্রবল প্রতান্বিত পাদরীর সামনে সেই নিঃসঙ্গ কুঁজো কুৎসিত দর্শন কোয়াসিমোদো নিজের জীবন বিপন্ন করে এসমারেল্ডাকে চিলের মতো ছোঁ করে মৃত্যুর হাত থেকে তুলে নিয়েছে ফাঁসিকাষ্ঠ থেকে। অবাক বিস্ময়ে দেখতে পাই–

কোয়াসিমোদো নিরীহ নির্বিবাদি দার্শনিক গ্রীনজোরির কাছে পৌঁছে দিয়েছে মৃত্যু ভয়ে আতংকিত এসমারেল্ডাকে।আর গ্রীনজোরি তাকে, এসমারেল্ডাকে, তার ছাগলসহ নদীর পাড়ে নিয়ে গছে। নদী পার করে বিপদসীমার বাইরে এগিয়ে দিয়েছে। ঠিক এ সময় এসমারেল্ডার মনে হল–এই কবি ও দার্শনিক লোকটি তাকে স্বার্থহীনভাবে ভালবেসেছে। তাকেই ভালবাসা দরকার--এই বেঁচে যাওয়ার ক্ষণে উপলদ্ধি করল এসমারেল্ডা–কবির জন্য আর কোনো করুণা নয়--তাকে ভালবাসা দেওয়ার জন্য সে প্রস্তুত।

কবি ভালবাসে শুধু সেই ভালবাসাটিকে। আর কিছু নয়। ভিতরের ভালবাসার মায়াটুকু। মায়ার মর্মটিকে। নদীর ওপারে পৌঁছে দিয়ে গ্রীনজোরি ফিরে গেল সেই পুরনো ভবঘুরেদের কাছে। যারা আগুনে পুড়িয়ে দিচ্ছে প্যারিস শহরটির বিখ্যাত চার্চটিকে–ভেঙে চুরে দিচ্ছে পাপের শহরটিকে। গ্রীনজোরির মনে কোনো খেদ নেই। সে এসমারেল্ডা নামের একটি রক্ত মাংসের মেয়েটিকে চায় নি। চেয়ে নিয়েছে তার প্রিয় ছাগলটিকে। ছাগলটির নাম জালি। জালি কখনো ভুল মানুষকে ভালবাসে না। সে জানে প্রকৃত ভালবাসা।

২.
আমার বাবার সঙ্গে ভিক্টর হুগোর এই ধ্রুপদী উপন্যাস দি হ্যান্স অব নতরদাম পড়েছি। সেই একাশি সালে। বাবা পড়েছে বারান্দায় শুয়ে শুয়ে। আকাশে চাঁদ উঠেছে। ফুল ফুটেছে। বাঁশি বাজছে। হাতি নাচছে। ঘোড়া নাচছে। আর পুকুর পাড়ে কে? পুকুর পাড়ে কোনো এক ছায়া। পুকুর পাড়ে কোনো এক মায়া। বাবা বলছে, ও কিছু নয়। কিছু নয়রে খোকা। ও জালি। গ্রীনজোরির জালি। গ্রীনজোরি নেই। গ্রীনজোরি পুকুর পাড়ে জালিকে একলা ফেলে রেখে কোথায় চলে গেছে---কেউ জানে না।

৩.
আমি জানি। গ্রীনজোরিকে আমি জানি। একদিন ঘুম ভেঙে গেলে দেখতে পাই–আমার টেবিলে গ্রীনজোরি একা বসে আছে। উল্টেপাল্টে দেখছে বইগুলো। ভুর্জপাতার মত কাগজগুলো। কি একটা কলম তুলে নিয়ে লিখতে শুরু করেছে। আর মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখছে–বাইরে তখন জল পড়ে–পাতা নড়ে।তোমার কথা মনে পড়ে।

তাকে বলি–কে তুমি?

গ্রীনজোরি ফিস ফিস করে বলে--আমি কেউ না। কেউ না।

এরপর ঝমঝম করে বৃষ্টি নামে মেঘ ভেঙে। বৃষ্টি পড়ে ঘরের চালে। গাছের ডালে।বৃষ্টির মধ্যে আবার আমি অক্লেশে ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে শুনি, জালি বৃষ্টির মধ্যে ছটফট করছে। জলে ফুটেছে পদ্ম। কে একটা মেয়ে দূরে দূরে ঘুরছে। তার চুল ভিজে হাওয়ায় ওড়ে। তাম্বুরা বাজিয়ে গান করছে-নিশিতে যাইও ফুল বনে।

৪. এই গল্পটি থাক। তাহলে ফুলবনের গল্প বলি।

ফুলবনে বহুদিন গেছি।সে সময় প্রতিদিনই গেছি। একা একা যেতে ভালবাসি।চারিদিক শুনশান–কেউ নেই। দুএকটা ঝিঁ ঝিঁ পোকা মাঝে মাঝে বেজে ওঠে। হাওয়ায় কখনো রাত্রিচর পাখির ডানার সাঁই সাঁই শব্দ। মাঝে মাঝে কয়েকটি শেয়াল জুল জুল চোখ নিয়ে সরে যায়। চন্দন বনে, জাফরান বনে আর কয়েকটা কুর্চি গাছের ফাঁক দিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদীটিকে দেখা যায়। তার ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শিশিরের সঙ্গে জেগে থাকে ওদের সঙ্গে সদ্যফোটা অন্ধকারের আলোর মধ্যে--
জ্বালাইয়া চান্দেরও বাতি জ্বালিয়ে বসে থাকি সারা রাতি গো।

৫.
এর মধ্যে এইসব দিনে একটি ফোন এলো। রিনরিনে গলায় মেয়ে কণ্ঠ বলল, তুমি কি একটু আসতে পারবে?

--কোথায়?

--ফুলবনে।

--ফুলবনে তো আমি রোজই যাই।

--জানি। তবে রাতে নয়–দিনে আসবে। তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।

কী কথা তাহার সাথে-তার সাথে? কে জানে। আমি হাও বলি না। নাও বলি না। টের পাই-- ফোনটি বেজে চলেছে। রিনরিনে গলা বলে চলেছে–এসো কিন্তু। এসো। দুপুরে। ফুলবনে।

৬.
দুপুর হওয়ার আগেই ফুলবনে পৌঁছে যাই। ফুরফুরে হাওয়া আসছে মলয় পাহাড় থেকে। হাসনুহেনা ফুটেছিল কাল রাতে–তার গন্ধ লেগে আছে ঘাসে। ঘাসের উপরে কে একজন বসে আছে। হাঁটু দুটো বুকের কাছে জড়ো করে ছায়ার মতো। হাওয়ার মতো কেউ বসে আছে। কে? কে বসে আছে এই ঘন দুপুরে ফুলবনে–চিলের ডানার গন্ধ মুছে ফেলে? চেয়ে দেখি–গ্রীনজোরি। গ্রীনজোরি বসে আছে একা। অধীর আগ্রহে চেয়ে আছে। চোখে বিপন্ন বিস্ময়। পথের দিকে অপলক চেয়ে আছে। আছে অপেক্ষায়।

যখন দুপুর এলো--মাথার উপর দিয়ে এক ঝাঁক ট্রেন উড়ে গেল দুরে গারো পাহাড়ের দিকে– আরও দূরে তুরা পাহাড়ের দিকে। তার পিছনে মালার মতো বকের পাতি উড়ে চলেছে। বকের পাতির সাঁই সাঁই শব্দ শুনে গ্রীনজোরি সহসা উঠে দাঁড়িয়েছে। তার পা কাঁপছে। হাত কাঁপছে। চুল কাঁপছে। পড়তে পড়তে বহুকষ্টে নিজেকে সামলে নিচ্ছে। একটু ওগুচ্ছে। আবার থামছে। এইভাবে ফুলবনে পার হয়ে চলে গেল গ্রীনজোরি। যেমন করে চলে গেছে এসমারেল্ডাকে নদীর পাড়ে রেখে। সঙ্গে এসমারেল্ডার সঙ্গী জালি। পিছন দিকে একবারও না ফিরে। সোজা সামনে। দূরে কোথাও। দুপুরের হাত ধরে। বিকেলের পিছনে পিছনে। সন্ধ্যার অন্ধকারে। রাতের গভীরে।

কবিতা

প্রভাতের প্রণয়গুচ্ছ

শৈলার ফকির ইলিয়াস

১
জলের কাছে গেলেই চমকে উঠি
এ কোন বেলা তোমার ছায়া হয়ে
স্রোতের গায়ে দিচ্ছে রোদের ছোঁয়া
ভালোবেসে উড়ছে পাশাপাশি
দেশান্তরি বনজ শালিখ জুটি ।

২
আমিও থাকি আত্মভোলা গাঁয়ে
ভোরের কুসুম তুষার বুকে জাগে
কী এক যাদু সূর্য এঁকে রাখে
প্রেম যমুনা নাচে শুভ্র পায়ে।

৩
নৃত্যকদম চিত্র দেখে দেখে
উড়াই ঘুড়ি শীতাকাশের গায়ে
সুতোর টানে বুকের পাঁজরগুলো
শব্দহাওয়ায় মিশিয়ে তোমার স্মৃতি
আরও কিছু বৃষ্টি জমা রাখে।

৪
মাঘের মায়ায় ডুবে গেলে নদী
নৌকোগুলো আটকা পড়ে চরে
তুমিও আছো বুকের বৃত্তঘরে
পুষ্প আমার, মগ্ন প্রেমের আদি।

ফকির ইলিয়াস - কবি। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা - দশ। সাহিত্যকর্মের জন্য পেয়েছেন " ঠিকানা সাহিত্য পুরস্কার ",“ফোবানা সাহিত্য পুরস্কার"। একাডেমী অব আমেরিকান পোয়েটস', এ্যমনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস , আমেরিকান ইমেজ প্রেস-এর সদস্য। বর্তমানে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন নিউইয়র্কে।

স্মৃতি রোমন্থন

আমি বাঁচতে ভীষণ ভালবাসি

শৈলার ফয়সল অভি

((আমার ভালবাসার যে ক্ষয়ে যাওয়া রূপ চোখের সামনে
দাগ রেখে যাচ্ছিল নাম তার হৃদয় ক্ষরণ.....

দু'হাত ভাঁজ করে মাথার নিচে যখন বালিশ দেই তখন আকাশের সাথে একটা সম্পর্ক তৈরী হয়। এই সম্পর্ক মধ্য রাতের আকাশ যখন হাত মুখ ধুয়ে প্রহরীর রূপ নেয় ঠিক তখনই আমি ও আকাশ মুখোমুখি। আমাদের এই যে সম্পর্ক তৈরী হয় তাতে চোখের পেছনে খুলির ভেতর যে মেগজ তার সেল জুড়ে কিছু চিন্তা খেলা করে আমি ছোট থেকেই ভীষণ দুরন্ত সকল ছেলেখেলা আমার প্রিয়'র তালিকায়। চিন্তার ভেতর হেঁটে হেঁটে শঙ্কের কোন বাঁক থামকে যাই অবাক হই নিঃশ্বাস জব্দ করে ভুলে যাই পলকটাকে চোখের মণিতে মাঝে মাঝে লিপে দিতে হয়। আমি অবিশ্বাস রকম আমার মতো বাঁচতে ভালবাসি। তাই আমার কাছে ভালবাসার রঙ বৃষ্টির ধুয়ে যাওয়া মাটি'র মতো।

যখন বুঝতে শিখেছে স্বর বর্ণের আত্মীয়তা সকল শব্দে ঠিক তখনই বাক্যের মতো সবুজ পড়ে যেতাম । বৈরাগী মাঠের চোখ রাঙানীতে সকাল থেকে সন্ধ্যা হতো আর জোনাকের মুঠো বন্দী খেলায় নক্ষত্র নেমে যেতো দাওয়ায়। অবাক হতাম দু'কান চেপে ধরে নৈঃশব্দের শব্দ মতো আমার হাতে মেঘ থেকে গলে যে জল পড়তো তার সচ্ছ শব্দ শুনে মাতাল হতাম। আমি মাতাল হতে ভালবাসি ।

শিশুপাঠের বইগুলো ধুলোয় জড়িয়ে পড়লে পাড়ি জমাতে হলো পিচঢালা পথ ধরে এক দেয়ালবন্ধ নগরে। যে নগরে আধারকে লুকিয়ে সবর্ত্র আলো জ্বলিয়ে রাখে নগরপিতা যদিও তিনি কোন সন্তান প্রসব করেনি। বাবাকে দেখেছি জীবনকে বয়ে নিয়ে যেতো আর আমাকে প্রস্তুত করতো পরবর্তী হালের জন্য। এবারও অবাক হলাম, নগরে কোন ঘ্রাণ নেই তবে এক টাকায় ঝাল দুটো চকলেট পাওয়া যেত । চাইলেই আকাশ ছোঁয়া যেতো ছাদের পিঠে চড়ে কিংবা মাথার উপর ঝর্ণা নামিয়ে আনা যেত সরু নলের ভেতর করে।

শহরের পথ ধরে রেললাইন চলে যেতো কোন জনপদে আর রাতের বেলা সোডিয়াম আলোতে নিজের গায়ের রঙ পাল্টে গিয়ে কোন এক পড়শী মনে হতো নিজেকে ।

শহরে এসে আলো খেতে শিখেছি নিরেট সোডিয়াম আলো আর তার পেট ছিঁড়ে বের হলে আমার যে গায়ের রঙ হতো আমি তাকে খুব ভালবাসি ।

আমার শহর ছিল সমুদ্র কাছাকাছি একদম ঠোঁটের নিচে উত্তাল কোন চিবুকের মতো। সমুদ্র আর নদীতে মাখামাখি ছিল শহরের পেট ও হাত। নদী যেখানে নিজকে বিসর্জন দিতো সমুদ্রে ঠিক সেখানটায় দাঁড়িয়ে বিলিয়ে দেওয়ার সুর ঢেউ এর মাতমে জানিয়ে দিত সমস্ত তীর আমি তার প্রেমে পড়ে আছি বহুকাল ধরে এবং প্রেমটাকে রেখেছি অপরিণত। কারণ মাঝে মাঝে আমি হারাতে ভালবাসি।

আমি এক সমুদ্র পাগল ছেলে যার বিশালতায় নেশা ধরে যায় চোখ থেকে সমস্ত শরীরে। প্রকৃতির সকল অঞ্চলের রেখাগুলো গড়িয়ে হাতের রেখা হয়েছে জন্ম থেকে। আমি মানচিত্র নিয়ে বাঁচি তাই জল ও সবুজ আমাকে ধারণ করে ভালবাসে।

কোষের সাথে সাথে যখন আঙ্গুলগুলো বড় হলো আর সাদা দেয়ালের শিরায় শিলায় জমলো শ্যাওলা, নগরের বর্ষা আর শীতের ভেতর বসন্ত কোন দ্বন্ধ রেখে যাচ্ছিল না তাতেই অস্থির হয়ে যাচ্ছিলাম। আমার ভালবাসার যে ক্ষয়ে যাওয়া রূপ চোখের সামনে দাগ রেখে যাচ্ছিল নাম তার হৃদয় ক্ষরণ।

ভালবাসার সকল রঙ লুট হয়ে যাচ্ছে দিব্যি উন্নয়নের দোহাই দিয়ে আর ঠায় দাঁড়িয়ে পায়ের আঙ্গুলে মাটি খুঁটে খুঁটে মাটি সাথে সম্পর্ক রেখে যাচ্ছিলাম । নিজেকে প্রতিবন্ধী মনে হচ্ছিল কারণ ভালবাসার বিলোপে এক মহাশুণ্য সমান শুণ্যতায় ভাসছিলাম । আমার ভালবাসার ভীষণ প্রয়োজন ছিল ।

আমি যখন শুণ্যতায় বন্ধণহীন ভাসছি ঠিক তখনই মধ্যাকর্ষের মতো তুমি টেনে নিলে প্রিয়তমা । প্রকৃতির সকল রূপ তুমি ধারণ করলে । যে জলে পা ডুবিয়ে জলের নৃত্য জেনে নিতাম তা তুমি দেখিয়েছো তোমার চোখের ভেতর এক মায়াময় গভীরতায় । যে গভীরতাকে অতল ভাবি আজও ফলে আমি ডুবতে ভালবাসি তাই সাঁতার আমার ভীষণ অপ্রিয় । যে হাওয়ায় সবুজের শীষ সামরিক কায়দায় কোন ঢেউ তুলে দিতো জমিনের বুক আমি তার ভেতর সংঘর্ষে জড়িয়ে যেতাম অবলীলায় আর এখন তোমার ছায়াবাদী চুলের ভেতর থেকে আমাকে সংঘর্ষের যে ডাক দিয়ে যায় তা অগ্রাহ্য করতেই পারি না । কি অদ্ভুত! বাধ্যগত সৈনিকের মতো তোমার চুলের ঢেউ খেলানো হাওয়ায় সংঘর্ষে জড়িয়ে যাই । ছেলেবেলায় সেই দুর্গার উত্তাল থুতনীতে আমার ভাঙ্গন হতো পুরো পুঁজা জুড়ে । ঢোলের শব্দ যতটা না কানে যেত তারচেয়ে দুর্গাদেবীর থুতনীর চাহনীতে আমি স্পর্শকাতর হয়ে যেত । মাটিতে গড়া মুর্তি থেকে জলজ্যান্ত তোমার থুতনীতে আমার স্পর্শকাতর ছেলেবেলা খুঁজে পাই। আমি অবাক হই জেনে, তোমার থুতনীতে তাঁকিয়ে আমার শরীর থেকে উৎপাদিত হবে শহরের সমস্ত বিদ্যুৎ। যে মাটিতে শুয়ে মাটির ঘ্রাণে মন ও শরীরের সকল ভার দিয়ে দিতাম মাটিতে ঠিক তেমনি তোমার ঘ্রাণ শুঁকে শুঁকে আমার নেশা হয়ে যায় । নেশাতুর চোখ নিয়ে নিজেকে ভাবি আর এক উপলদ্ধিতে জানিয়ে দিই, প্রিয়তমা তোমাকে আমি প্রচণ্ড ভালবাসি কেননা এই মহাবিশ্বে তোমার ভালবাসাতেই আমি বাঁচি আর আমি বাঁচতে ভীষণ ভালবাসি ।

শৈলার: ফয়সল অভি

নিজের সম্পর্কে: আমি মানুষ এর চেয়ে বড় কোন পরিচয় আমার নেই ।
ভালবাসেন: মাকে যে আমার গর্ভধারিণীকে প্রসব করেছে
প্রিয় ব্যক্তিত্ব: হুমায়ুন আজাদ ও আহমদ ছফা
অবসরে: কোন অবসর নেই
বর্তমানে: পাকস্থলির জন্য আইনপেশার সাথে জড়িত হয়ে আইনজীবি হিসেবে জীবণ ধারণ করছি।
প্রিয় বাণী: ঈশ্বর ঘুমিয়ে-দেবতারাও স্বপ্ন দেখছে । শুধু জেগে আছে মানুষ। নীল রঙ বয়ে নিয়ে যায়-সৃষ্টির অপরাধে (ফয়সল অভি)।

কবিতা

প্রবাহ -প্রবণ

শৈলার শৈবাল

আমার ভিতর প্রতিজন আমি
কখনো খুঁজি না
আমার শূন্যতা একজন তুই
নিখোঁজ সংবাদ ,
সোডিয়াম ঘ্রাণে পাণ্ডু চন্দ্রানন
দেখি ;শুল্ক চাস্

আদিম পুরুষ কতোটাবা দিতে পারবো জানি না
কালের আধুলি যা জমিয়েছি তাও তো অচল

গড়িয়ে গড়িয়ে বৃত্তের আধুলি এখন বিন্দুতে
মূল্যহীন বিন্দু থেকে উঠে আসি আর ডুবে যাই ,

তোর শুষ্ক ঠোঁটে তিল ছুঁয়ে বলি ;মকুফ করসি
আর কিছু দিন আবার তো চলে যাবে এ খড়িস

আমিও ওপাশে শীত কুয়াশার শুদ্ধ সিত হবো ,
দিগন্তে চলছি চিঠিতে বেওয়ারিশ সীল মেরে দিস্ ।

চলতে চলতে গড়াতে গড়াতে বৃত্ত থেকে বিন্দু ...
জাতিস্মর গল্প শুনাবো মণ্ডপে শতাব্দীর উৎসবে ,

শাপগ্রস্ত ক্ষত শানাই শাশ্বত নিবাত নিরবে
শুরু থেকে শেষ আঁতুড় গড়িয়ে শ্মশান অবধি

নাড়িকাটা থেকে মরার মুখাগ্নি পরম প্রবাহ
পুনর্জন্ম যতো পরম্পরা সব জানি সব বলি,

বাল্যস্মৃতি ! সকালের ডিম পোচ , বিকেলে বারান্দায় গ্রিল ধরে বিষন্ন দাঁড়িয়ে থাকা আর রাতের এক গ্লাস দুধের মতো পানসে । বলতেও স্বাদ পাই না ।

প্রথম ভালো লাগা ! বয়েজ স্কুলে বাল্য প্রেমের সুযোগটুকু ছিল না তারপর কলেজ সুন্দরী মেয়েদের দিকে তাকিয়ে তাদের মাস্তান বয় ফ্রেন্ডদের সাথে ডুয়েটে নামার সাহস করিনি । তার পর মেডিকেল কলেজ এখানের মেয়েদের চোখে তাকিয়ে থাকলে দু ,তিন পৃষ্টা এনাটমি লেখা গেলেও পাখির নীড় মনে হবে না কখনো ।তাই বিশেষ কিছু ভালো লাগা ভিন্ন করে নেই।

আমি !... কবিতা নিয়েই থাকতে চাই। শৈলীতে আমি চমৎকার মানুষদের পেয়ে গেলাম এখান থেকেই শিখতে পাচ্ছি সানন্দে প্রাণের মানুষদের থেকে সত্যি বলি শৈলী আমার কাছে শুধু একটা ব্লগ না, আমার প্রাণের একটা দখিনা বাতায়ন ..

যতটুকো দেখি তাতে চোখ পুড়ে ,জুড়ে ছাই হয়
নিজের শেষটা দেখবো বলেই দুচোখ বুজেছি

রক্তের দাগেই সব দেখি স্পষ্ট প্রবাহ-প্রবণ !

[আমার শব্দ-শূন্য দিনের প্রশ্রয় , জানালার পাশে পাহাড়ের হরতকি গাছের এক পেঁচাকে ... শুভ বিদায় , তোর নীল প্রজাপতি আমার কাছেই থাক , শুল্ক এক অধুলি ভালো থাকিস]

— — — — — –

প্রবন্ধ

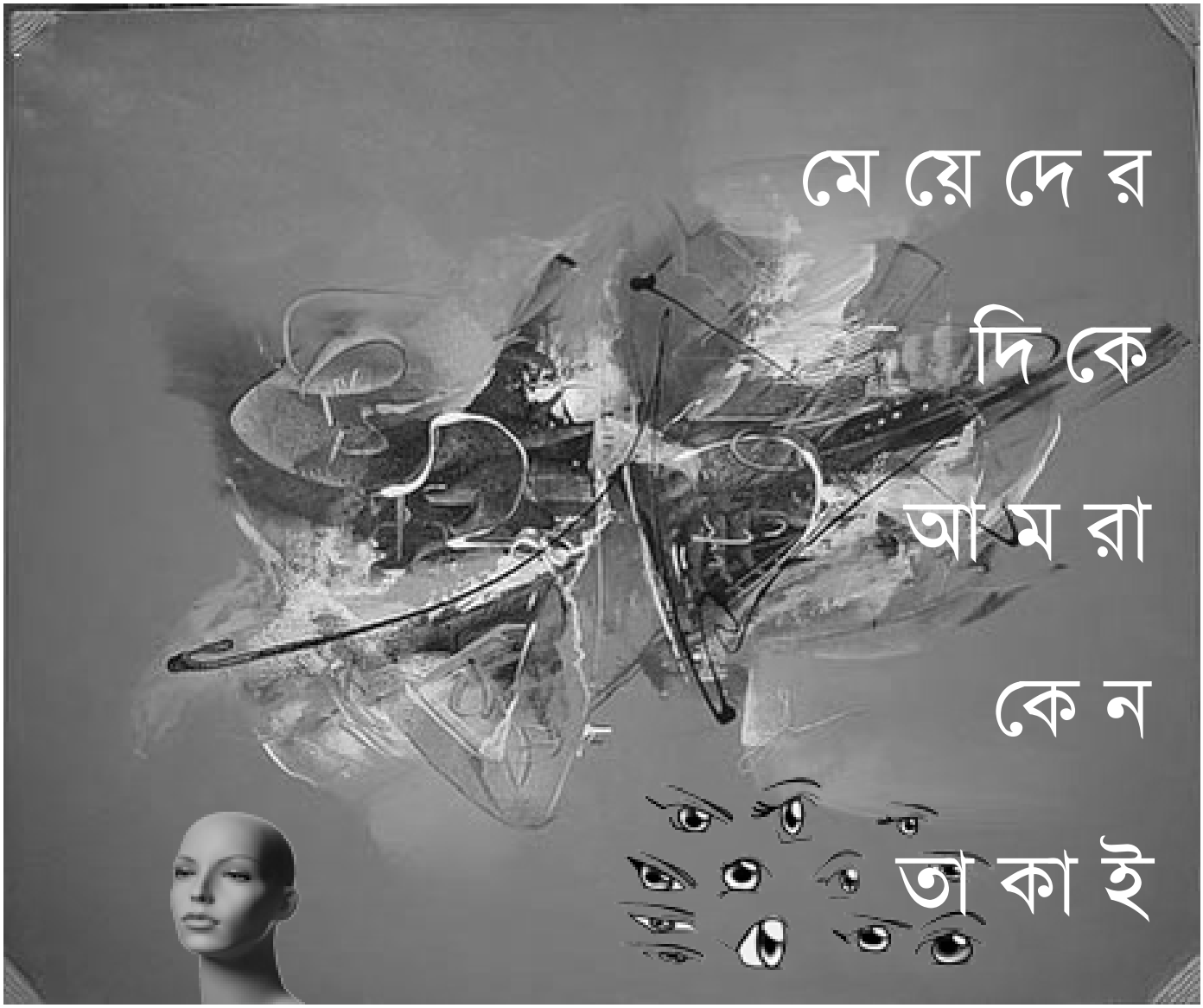

মেয়েদের দিকে আমরা কেন তাকাই

শৈলার মলয় রায়চৌধুরী

((সঙ্গে-সঙ্গে কেমন একটা অনুরণনের মুহূর্ত তৈরি হয়। চিন্তার গভীরতায় নয়, কেননা দেখা হয়ে গেলে সে-সব নিয়ে আর ভাবি না। আমি একে নাড়া খাওয়া বলতে চাই না।

আমরা অনেক জিনিস কেবল দেখি, তাকিয়ে থাকি সেদিকে কিছুক্ষণ, তাকিয়ে থাকার জন্যে তাকাই, হয়তো একটি মুহূর্তের জন্যে। কোনও মেয়ে দেখলে তার দিকে তাকাই। ম্যাজিক হলে সেদিকে তাকাই, সার্কাসের দিকে তাকাই; তাকাবার জন্যে উঠতি সূর্যের খোঁজে যাই কাঞ্চনজঙ্ঘা বা পড়ন্ত সূর্যের খোঁজে যাই কন্যাকুমারীল পুরীর সমুদ্রের ঢেউ বা হরিদ্বারের জলস্রোতের দিকে তাকাই। তারাপীঠের কালীর মুখের দিকে তাকাই বা ছুটে বারান্দায় গিয়ে বরযাত্রীর দিকে তাকাই, বা পুকুর পাড়ে মাছের দিকে তাকাই।

কেন তাকাই?

সে-সব তাকানোর সঙ্গে গভীর চিন্তার সংস্রব থাকে না। তাকাবার পর কোনও কিংবা বিশেষ দার্শনিক প্রতিক্রিয়া ঘটে না মননে। দেখলুম, ব্যাস, কাজ শেষ। কিন্তু কেন দেখি?

আগেকার কালে এরকম ধারণা ছিল যে যা সুনদর তা আমাদের আকৃষ্ট করে । কিন্তু সুন্দর হোক বা কুৎসিত, এই বাইনারি বৈপরীত্যের অস্তিত্ব তর্কের খাতিরে স্বীকার করে নিলেও আমরা কিন্তু সুন্দর-কুৎসিতের ভেদাভেদ দেখার আগে ওব্দি, এবং পরেও করি না। পথে চলতে-চলতে একজন পটচাঝঈ মহিলার দিকে যখন তাকাই তখন কী চাই? আমি আমার কাছ থেকে কী চাই? সুন্দরী না হলেও তাকাই। পথদুর্ঘটনা হলে তাকাই। ঝগড়াঝাঁটি হলে তাকাই। তাকিয়ে দেখবো বলে ছবি আঁকিয়ের প্রদর্শনীতে যাই।

যাকে বা যে-ব্যাপার দেখি, আমরা কিন্তু তার জন্যে দেখি না। আমরা নিজের জন্যে দেখি। আমার দেখায় তার কি এলো-গেল তা নিয়ে ভাবি না। আমি আমার কাছ থেকে কিছু-একটা চাই বলেই দেখি। কিন্তু প্রত্যেকবার তাকালেই যে তা হবে তার স্থিরতা নেই। আমরা সবসময়েই যৌনতার জন্যে কোনও নারীর দিকে তাকাই যে তা নয়। মা কালীর মুখ মোক্ষ-প্রাপ্তির জন্যে দেখি না। তুরীয় আনন্দের জন্যে যে পাঁঠা বলি দেখি, তা নয়। আনন্দ পাবো বলে সূর্যোদয় বা শূর্যাস্ত দেখি না। এমন নয় যে যা দেখি তা ভাললাগে; কিন্তু তবু দেখি।

দেখলে, সঙ্গে-সঙ্গে কেমন একটা অনুরণনের মুহূর্ত তৈরি হয়। চিন্তার গভীরতায় নয়, কেননা দেখা হয়ে গেলে সে-সব নিয়ে আর ভাবি না। আমি একে নাড়া খাওয়া বলতে চাই না। হয়তো একে চমৎকৃত হওয়া বলা যায়। কিন্তু দেখার আগে চমৎকৃত হবো কিনা জানি না। কিংবা যেমন তাজমহলের ক্ষেত্রে, চমৎকৃত হবো ভেবে দেখতে গিয়ে হই না। অথচ কালবৈশাখীর দাপটে নারকেল গাছের পাতাদের একপাশে হেলে গিয়ে দুলছে দেখে চমৎকৃত হই। যদিও মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তা দেখতে থাকলে ভয়ের উদ্রেক হবার সম্ভাবনাকে বাদ দেওয়া যায় না।

অনুরণন কেন ঘটে?

যে-প্রাণী, ঘটনা বা জিনিসের দিকে তাকাই, তার ক্ষমতা নিজের সীমানা ছাড়িয়ে বৃহত্তর জায়গায় পৌঁছোয়। যে দেখছে তার মধ্যে তৎক্ষণাৎ একটি জটিল ও জীবন্ত সাংস্কৃতিক সাড়া জাগিয়ে তোলে, তা অজানা বা অচেনা হতে পারে। যে দেখছে, তাকে মুহূর্তের জন্যে থামিয়ে দ্যায়। যে দেখছে সে নিজের দেখবার প্রক্রিয়ার মধ্যেই গ্রেপ্তার হয়ে যায়।

দেখি বলে, দৃষ্টি আকর্ষণের তোড়জোড় হয়। নারী সাজগোজ করতে পারেন। অট্টালিকার স্থাপত্য অন্যরকম হতে পারে। সত্যসাইবাবা ম্যাজিক দেখাতে পারেন। পত্রিকার প্রচ্ছদ রংবেরং হতে পারে। একে অনেকে বলেন চিত্তাকর্ষক। এখানে চিত্তের কিছু করার নেই। মনের ভাবার সময় নেই। মুহূর্তের মধ্যে প্রভাবিত হবার প্রশ্ন ওঠে না। কেননা দেখি আর ভুলে যাই। মেয়েদের দিকে চোখ বুলোই আর এগোই, হয়তো তখন মনে-মনে অন্য কোনও চিন্তা চলছে, এমনও হতে পারে।

যে প্রাণী, ঘটনা বা জিনিসকে মুহূর্তের জন্যে, v u l n e r a b l e লাগে, দেখার মাধ্যমে, সেদিকেই বোধহয় তাকাই আমরা। অনেকে মিউজিয়ামের এঘর-সেঘর ঘুরে কোনও একটি দর্শনীয়ের সামনে দাঁড়িয়ে চমৎকৃত হন। মিউজিয়ামে ভাঙাচোরা মূর্তি দেখবো বলে প্রস্তুত হয়ে যাই। তার মানে চমৎকৃত হবো বলে প্রস্তুতি নিই। অথচ পরে স্মৃতিতে ধরে রাখি না অনেক কিছুই। যা দেখি তা ছোঁয়া যাবে না, তার স্বত্বাধিকারী হওয়া যাবে না, ভোগদখল করা যাবে না। আর দেখার সময় আমার সেসব চিন্তাও করি না। কোনও আধ্যাত্মিকতা নেই, শিল্পবোধ নেই, শিক্ষিতকরণ নেই, আধুনিকতার ব্যাপার নেই, ক্ষণমুহূর্তের দেখাটির মধ্যে।

আগেকার দিনে রাজারাজড়াদের দেখাবার জন্যে, 'খুশি' করার জন্যে, প্রজারা, ব্যাপারিরা, নানা বিদঘুটে জিনিস উপহার দিতেন বা ক্যারদানি প্রস্তুত করতেন। স্রেফ তাকা বার জন্যে। মনোযোগ দিয়ে, সতর্কভাবে দেখার জন্যে নয়। উদ্দেশ্য থাকে না অমন চাউনিতে। অনুরণনের ক্ষমতা, সেই ক্ষণটুকুর জন্যে, যে দেখছে তার খাতিরে, ওই বস্তুটির বা ঘটনার বা প্রাণীটির মধ্যে জাগ্রত হয়। অনুরণনটি প্রেম নয়। অভিজ্ঞতা শুরু হবার আগেই আমাদের দেখার পর্বটি শেষ হয়ে যায়।

অনন্ত পৃথিবীতে একটি জটিলতম সংকেত এক পলকের জন্যে তৈরি হয়।

দেখার মুহূর্তটিই তো কবিতা। নয় কি?

গল্প

ধূসর প্রেমের প্রথম চিঠি

শৈলার প্রহরী

-আমার নাম আদ্রি, আদ্রি রহমান। হ্যাঁ আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি, কিন্তু আপনি তা কি করে বুঝলেন?

-সে তুমি বুঝবে না বাপু। বুঝলে হে। বয়স, বয়স হলে অনেক কিছু এমনিতেই বুঝে নেওয়া যায়.....

"আমি কমল, পুরো নাম শ্রী কমল ব্যানার্জী"। এই ভাবেই পরিচয় হলো হাওড়া স্টেশনের প্রকান্ড আমগাছের নীচে বসে থাকা কমল বাবুর সাথে। অনিচ্ছা সত্যেও ঘাঁর বাঁকিয়ে, হাত বাড়িয়ে দেয়া লোকটার মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে নিলাম একবার। মাথায় বাদুরে টুপি। গলায় ঝুলছে ভারী উলের লম্বা মাফলার। ধবধবে সাদা ধূতির সাথে হাল্কা বাদামী রং এর পাঞ্জাবী। কুনুই এর কাছে কিছুটা ছিড়ে যাওয়া কালো কোট দিয়ে ঢেকে রেখেছেন জীবনের ভারে নুয়ে পরা দেহটা। বয়সের ভারে মানুষ যতটা নুয়ে পড়ে জীবনের ভারে বুঝি তার চেয়েও বেশী। তবু, দেখতে বেশ পরিপাটি ভদ্রলোক। কিছু কিছু ফুল যেমন তার নিজ রূপেই উদ্ভাসিত করে নিজের সৌন্দ্রয্য, তেমনি কিছু কিছু মানূষও চেহারার সৌন্দর্য্যকে উদ্ভাসিত করে তোলে মনের সৌন্দর্য্য দিয়ে। পঞ্চাশোর্ধ বয়সের এই বৃদ্বকে না দেখলে, তা বোধ হয় বিশ্বাস করা হত না। চশমার ভারী গ্লাসের ফাঁক দিয়ে, স্বচ্ছ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। চোখে মুখে লেগে আছে এক অমায়িক স্নিগ্ধতার হাসি। দুরের মানুষকে কাছে টানার, অপরিচিতকে আপন করে নেয়ার এক মায়াবী আমন্ত্রন লুকিয়ে আছে সেই হাসির ভিতর। আমার মত বয়সের তুলনায় অতিরিক্ত ধীরস্থীর ও সহজেই সবকিছুকে এড়িয়ে চলার মত একজন যুবকও, সেই আমন্ত্রনের হাতছানি এড়িয়ে যেতে পারলো না। আমি তার চোখে চোখ রেখে মৃদু হেসে মাথা দুলাতেই ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিয়ে জানতে চাইলেন,

-তা বাবুর নামটা যেনো কি? ওপাড় থেকে আসা হলো বুঝি?

-আমার নাম আদ্রি, আদ্রি রহমান। হ্যাঁ আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি, কিন্তু আপনি তা কি করে বুঝলেন?

-সে তুমি বুঝবে না বাপু। বুঝলে হে। বয়স, বয়স হলে অনেক কিছু এমনিতেই বুঝে নেওয়া যায়, হেহেহে।

বলেই, ভদ্রলোক আপন মনে হাসতে লাগলেন। অবাক হয়ে খেয়াল করলাম অসম্ভব সুন্দর করে হাসেন কমল বাবু। এই বয়সে শ্মশ্রুশোভিত মুখের এমন সচ্ছ হাসি, যৌবনে কত মেয়েকে কাঁদিয়েছে কে জানে? তার বাদামী রঙ এর লম্বাটে চেহারার কপাল জুড়ে বসে আছে, উড়ন্ত ঈগলের ডানার মত কাঁচা-পাকা রঙের এক যুগল জোড়া ভ্রু। সেই ভ্রুর নীচে কোনো এক চাঁপা বেদনার ঢেউ-এ আন্দলিত উজ্জল তারার মত দুটি চোখ।

শৈলার: প্রহরী

নিজের সম্পর্কে: বিশেষ ভাবে বলার মত কিছু নেই। লিখতে ও কবিতা আবৃতি করতে ভালবাসি।

রিতার মুখে অনেক বার শুনেছি, জোড়া ভ্রু-ওয়ালা ছেলেরা নাকি অনেক বউ আদুরে হয়। কি জানি হবে হয়তো! অনেকক্ষন ধরে চুপচাপ বসে আছি, কিন্তু কমল বাবু অনর্গল কথা বলে যাচ্ছেন। কিছুই মনযোগ দিয়ে শোনা হয়নি আমার। শুধু মাঝে মধ্যে হ্যা হু করে মিথ্যা শোনার ভান করছি।যেমনটি আজ কাল রিতার সাথে প্রায় করি। রিতা আমার ক্লাশ ফ্রেন্ড অবশ্য শুধু ক্লাশ ফ্রেন্ডই নয়, তার চেয়েও একটু বেশী। আমার মা-বাবা মনে মনে ঠিক করে রেখেছেন, বি.কম টা ফাইনাল দিলেই রিতাকে বউ করে ঘরে তুলে নিয়া আসবেন।

রিতাও বোধ হয় সে কথা জ়ানে। তার চোখমুখের মিষ্টি ঈশারায় তা স্পস্ট বুঝা যায়। আগত সংসারের ভবিষত স্বপ্নে বিভোর রিতা, সারাক্ষন আমার পাশে পাশে থাকে। প্রতিদিন কলেজে আসার সময় নিত্যনতুন কিছু না কিছু রান্না করে নিয়ে আসে। লাঞ্চ আওয়ারে পাশে বসে নিজ হাতে আমার মুখে তুলে দিয়ে মুচকি হেসে বলে, ‘ জানো? এইটা আজ আমি রান্না করেছি, কেমন হয়েছে বলোতো?’ -যদিও জানি এসবের কিছুই সে রাঁধেনি, বাসায় গেলেই খালাম্মার কাছে তার প্রমান পাওয়া যাবে। রিতা তখন তার মা’কে বলবে ”এই পৃথিবীতে তোমার মত মা আমি দ্বীতিয়টি দেখিনি। যার কিনা পরের ছেলের কাছে নিজের মেয়ের বদনাম করতে একটুও দিদ্বা করে না”। খালাম্মা মৃদু হেসে বলবেন ” শোনো মেয়ের কথা, তুই পরের ছেলে বলছিস কাকে? আদ্রি’তো আমার ছেলের মত, ও পরের ছেলে হতে যাবে কোন দুঃখে!” রিতা তখন দরজার মেরুন রং’এর পর্দাটা সরিয়ে চা’এর ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকবে। পাশে বসে এক কাপ চা বানিয়ে আমার হাতে তুলে দিতে দিতে বলবে “ এই নাও, এইটা আর অন্য কেউ বানায়নি, আমি নিজ হাতে তোমার পাশে বসে বানিয়ে দিলাম। এইবার বিশ্বাস হলতো? যে চা বানাতে পারে সে রান্নাও করতে জানে”।

সেই রিতাকে আজকাল তেমন আর ভালো লাগে না। তার সঙ্গ এখন মনে হয় পোকায় ধরা মিষ্টি আমের মত। কেমন যেনো বিরক্তিকর লাগে সব কিছু। ঠিক বুঝাতে পারবো না কাউকে। প্রতিদিনই একান্তে লুকানো ভালো না লাগার কথা, কাউকেই বলতে পারছি না। তাই একাই ভোগ করি বেদনার সব বোঝাপরা আর একাকী বাঁশীর কস্টরাগ। যে রিতার চুড়ির রিনিঝিনি শব্দ ছাড়া আমার ঘুম ভাংগে না, যে রিতার উরন্ত চুলের ঢেউ’এ পাল তোলে আমার স্বপ্ন ঢিংগা, সেই পাল’এ ধীরে ধীরে লেগেছে এক ঘেয়েমির হাওয়া। অবাকের শেষ সীমানায় দাঁড়িয়ে ক্লান্ত আমি, ভাবনার হাওয়ায় নিজমনে আঁকিবুঁকি করি বিধাতার দেওয়া ভাগ্যলিপি। তবে কি প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা সব কিছু ক্ষনিকের মোহ? এত মধুর প্রেমও কি সময়ের দীর্ঘতায় পানশে হয়ে যায়? মধুর ঘনত্ব হারাতে হারাতে হয়ে যায় একেবার তরল? এখন জীবনের খর স্রোতে উচ্ছল জলের রেখায় চলাচল করে কেবল মৃতমাছের ঝাঁক। আহ, সব কিছু কি অদ্ভুত শুন্য শুন্য লাগে। তাহলে সবটাই কি সামসুল হকের সেই কবিতার মত ? “মানুষ এমন তয়, একবার পাইবার পর নিতান্ত মাটির মনে হয়, সোনার মোহর”!

হঠাত করেই কমল বাবুর ডাকে হ্যাঁচকা টান লাগে এলোমেলো ভাবনার জালে।
-কি হে, এতক্ষন ধরে ডাকাডাকি করেও কোনো জবাব পাচ্ছিলুম না যে? তা বাপু কি এমন ভাবছো বলো দেখি শুনি?
"না না, তেমন কিছু না" বলেই আমি কথা ঘুরাতে পালটা প্রশ্ন করলাম,
-আচ্ছা কমল বাবু, একটি কথা জিজ্ঞাস করবো? যতোটুকু দেখতে পাচ্ছি আপনার শরীর খুব একটা বেশি ভালো নেই, তবু আপনি বাহিরে এই ঠান্ডা বাতাসে বসে আছেন কেনো?
-হা হা হা এই কথা? আমিতো ভাবলুম কি না কি জানতে চাইবে হে। শোনো তাহলে, এক সময় আমারও ঘরের ভিতর নিজেকে গুটিয়ে রাখতে ভালো লাগতো, বুঝলে? ছোট বেলা থেকেই খুব ঘরমুখো ছিলুম, কলেজ থেকে ফিরে এসে সোজা উঠে যেতুম দো'তালার চিলেকোঠায়। সেখানেই গান শিখা, লেখা পড়া ও খাওয়া দাওয়া সেরে ল-ম্বা ঘুম। চিলেকোঠার জানালা দিয়ে নীলাকাশের সাদা মেঘের ভেলায়, উড়ে উড়ে পূব থেকে পশ্চীমে চলে যেত আমার এক একটি দিন। আ-হা, ভাবনা হীন দু'চোখে স্বপ্ন ভরা সেই যে আমার নানান রঙের দিন গুলো। কিন্তু কুরচি, বুঝলে? কুরচি। হঠাত করে কোথা থেকে এই মেয়েটি এসে, আমাকে আমার ভিতর থেকে এমন ভাবে টেনে বের করলো যে, জীবনে আর কোনোদিন ঘর মুখো হতে পারলুম না।
কোটের পকেট থেকে উটের হাড় দিয়ে বানানো একটি ছোট্ট লম্বা বাক্স ও রূপার তৈরী মাঝারি সাইজের একটি তামাকদানী বের করে, কমল বাবু তামাক সাজাতে সাজাতে আত্ম প্রলাপের মত কথা গুলো বলে গেলেন। আমি তেমন কিছু বুঝতে না পারলেও এতটুকু বুঝলাম, কোনো এক কুরচি দেবীকে হৃদয়ের মাঝে প্রেমের চাদর বিছায়ে স্বযতনে লালন করে বেড়াচ্ছেন এই বৃদ্ধ। তারসাথে আরও বুঝলাম, বড়ই স্টাইলিস্ট, বড়ই সৌখিন ধরনের ধুমপায়ী এই কমল বাবু। তিনি যখন উটের হাড়ের ছোট্ট লম্বা খাপ থেকে কালো চকচকে বাঁকা পাইপটি বের করে ঠোঁটের কোণে ঝুলিয়ে দিয়ে মনের আনন্দে টানছেন। আমি তখন অবাক হয়ে দেখছি, কেমন করে তামাকের মনোমুগ্ধকর খুশবু চারিদিগের বাতাসকে মাতোয়ারা করে দিয়ে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে স্বপনীল ঘোরে। আমি কখনো ধুমপান করিনি, কিন্তু আজ কমল বাবুকে দেখে 'জীবনে একবার হলেও এই তামাক খেয়ে দেখব" বলে, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম। এ'কথা সে'কথার পর জানতে চাইলাম,
-কমল বাবু, তামাকের যে এত রোমান্টিক ঘ্রাণ থাকে তা আমি জানতাম না। এই তামাকটার নামটা কি আমাকে একটু বলবেন? তাছাড়া, আপনার পাইপটিও খুব সুন্দর। কত দিয়ে কিনেছিলেন ঐ টি?
-তামাকটির নাম এ্যারোমেটি ম্যাগনোলিয়া। ভারতের লৌক্ষ্ণ ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না হে। আর পাইপটির কথা বলছো? সেতো বলতে পারবো না বাপু। তবে হে, আজ থেকে তেঁতত্রিশ বছর আগে আমার একুশতম জন্মদিনে কুরচি এটি কিনে দিয়েছিলো। তা এখনো মনে আছে।
-বলেন কি কমল বাবু? তেতঁত্রিশ বছর আগের জিনিস এখনো আপনি এত যত্ন করে রেখে দিয়েছেন? আর এই কুরচিদেবী'টি কে? একটু বলবেন? আমি খেয়াল করছি যখনই আপনি উনার কথা বলেন, তখনই আপনার চোখ দুটো কেমন ছল ছল করে উঠে, কেনো বলুনতো?

কমল বাবু গলায় মাফলারটা আরো ভালো করে পেচিয়ে, হাতে ধরা পাইপটি ঠোঁটে ঝুলিয়ে কয়েকটা টান দিয়ে কাশতে কাশতে ভেসে গেলেন তার পুরাতনী যৌবনের দেশে,

-সে অনেকদিন আগের কথা হে। আমি তখন সবে মাত্র কলকাতা শহর থেকে অজপাড়াগা'এ পিসি'র বাড়িতে এসে উঠেছিলুম। তারপর, সেখানকার শ্রী ধর্মেন্দ্রনাথ কলেজে ইন্টারে ভর্তি হলুম।

-কেনো? মানুষতো গ্রাম থেকে শহরে পড়তে যায়। আপনি শহর ছেড়ে একেবার গ্রামে চলে গেলেন কেনো?

-কলকাতার ছোকরাদের সাথে মিশে আমার নাকি লেখাপড়া গোল্লায় যাচ্ছিল। তাই এন্ট্রাস পাশ করার পর বাবা ও দাদা ঠাকুর অনেকটা জোর করেই, আমাকে পিসিমার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। আমিও তেমন কিছু বলিনি। দূঁরে চলে গেলে অন্তত আর যাই হোক, সব সময় তাদের রক্তচক্ষু করা শাসন মানতে হবে না ভেবে রাজি হয়ে গেলুম।

-তারপর?

-তারপর, অনেকদিন পরের কথা। আমি তখন সবে মাত্র ইন্টারপাশ দিয়ে বি,এ, ভর্তি হয়েছি। পিসিমার বাড়ির দোতালার চিলেকোঠা থেকে শুরু করে কলেজের সাংস্কৃতি সন্ধায় আমার জীবনের সমস্ত হিসাব নিকাশ। বাড়ি থেকে মায়ের চিঠি আসে "কমল, পুজোর ছুটিতে একবার বাটি'তে এসো। তোমার জন্য পাত্রী দেখেছি, পাত্রী'ত নয় সাক্ষাত স্বরসতী"। ধুম্রছায়ার মত ঘোরপাক খেতে খেতে কুন্ডলী বাঁধে স্বপ্নের অপ্সরা, রাজত্ববিহীন ভাবনাহীন রাজত্ব আমার। লাগামহীন সুখের পিঠে আমি যখন সাওয়ার ঠিক তখনি, হঠাত একদিন কলেজের করিডোরে আমার একমাত্র বন্ধু জয়দেব পরিচয় করে দিলো কুরচি দেবীর সাথে।

-এই যে কমল, আমি তোকেই খুচ্ছিলুম। লাইব্রেরী, কৃষ্ণতলায় কোথাও পেলুমনা। কোথায় থাকিস বলতো?

-কেনো রে ? কি হয়ছে ?

-যাকগে, বাদ দে। যে জন্যি খুচ্ছিলুম। এদিকে আস পরিচয় করিয়ে দেই। এই হলো আমাদের ডিপার্টমেন্টের সবচেয়ে ভাল ছাত্রী কুরচি। যার কথা অনেকবার তোকে বলেছি, আর কুরচি এ হলো.....

-থাক থাক তোকে আর পরিচয় করিয়ে দিতে হবে না। নিজের পরিচয় অন্যের মুখে শুনতে ভাল লাগে না। আমি নিজেই পরিচয় হয়ে নিচ্ছি। নমস্কার, আমি কমল ব্যানার্জী। বাংলা ডিপার্টমেন্টে আছি। আপনার কথা অনেক শুনেছি জয়দেবের মুখে। আজ দেখার সৌভাগ্য হলো। চলুন না কোথাও বসে কথা বলি।

কুরচি দেবী কিছু বলার আগেই জয়দেব বলে ফেললো,

-হ্যাঁ, তাই চল। আমাদের এখন কোনো ক্লাশ নেই, কৃষ্ণতলায় বসে আড্ডা দেওয়া যেতে পারে।

জীবনে অনেক মেয়ে দেখেছি, কিন্তু এমন করে কারো মুখপানে চেয়ে থাকিনি কখনো। কি যেনো ছিলো ঐ মুখ খানিতে! খুব সল্পভাষী ছিল কুরচি দেবী। কিন্তু যখন কথা বলতো, তখন কথার ফাকে ফাকে তার ভাংগা হাসির টুকরো ঝরে পরতো অধর থেকে। সেই হাসির সাথে আমার ছোট্ট পৃথিবীর বড় বড় কষ্ট গুলি, মৌ্রি ফুলের মত থোকায় থোকায় ঝরে যেতে লাগলো।

কুরচি জাতে ব্রাহ্মণ, কুলিন ঘরের মেয়ে। দীর্ঘ কেশের কালো গভীর অন্ধকারে তার কাঠালচাঁপা বর্ণের গোলাকার মুখশ্রী, যেনো আফ্রিকার গহীন কয়লার খনিতে এক টুকরো রূপালী হিরক। শাপলার পাপড়ির মত নিলাভ অধরে সব সময় লেগে থাকতো হেমন্তের শিশিরের মত এক বিন্দু সিক্ত হাসি। সেইদিন, মাত্র অল্পকিছুক্ষন আমরা আড্ডা দিয়েছিলুম কৃষ্ণতলায়। কিন্তু সেই অল্প সময়ের মাঝেই আমি বুঝতে পারলুম, জীবনটা শুধু দোতালার চিলেকোঠায় শুয়ে ভাংগা জানালা দিয়ে আকাশ দেখা নয়। জীবনেরও প্রয়োজন জীবন। কুরচি দেবীর প্রথম দর্শনেই আমি পরাণের মাঝে খুঁঝে পেলুম প্রাণ। এমনি করে প্রেম আর প্রাণের ভেলায় কি করে যে ভেসে গেল দুটি বছর বুঝতে পারলুম না। বি, এ, ফাইনাল হয়ে গেল। কথা ছিল পরিক্ষার পর কলেজ ট্যুরে আগ্রা যাওয়া হবে। এক এক করে সবাই এসে জমা হলো কৃষ্ণতলায় কিন্তু অনেক খুজেও ঈদিতাকে কোথাও পেলুম না। সেদিন আমারও আগ্রায় যাওয়া হলো না। বিষন্ন মনে বাসায় ফিরে গেলুম, কিছুই ভালো লাগছিল না।

-তারপর ?

-আমি সব সময় কলেজ থেকে বাসায় ফিরে সিঁড়ি বেয়ে সোজা দোতালার চিলেকোঠায় উঠে যেতুম। পায়ের আওয়াজ শুনেই পিসিমা ডেকে বলতেন, “কমল এসেছিস বাপ? তুই হাত মুখ ধুয়ে নে আমি জল খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি”। কিন্তু সেই দিন পিসিমার গলার কোনো আওয়াজ পেলুম না। বাড়ীটা কেমন যেন ভুতড়ে হয়ে গেছে। জামা-কাপড় খুলে কলতলা থেকে হাত মুখ ধুয়ে আসতেই খেয়াল করলুম, আমার এগারো বছরের পিসতুতো বোন শেফালী দরজা দিয়ে উঁকি মেরে আমাকে দেখছে। আমি তাকে ডেকে জিজ্ঞাস করলুম, “এই পুঁটলি বাড়িতে কি হয়েছেরে, সবাই এত চুপচাপ কেন? পিসিমা কোথায়?” পুঁটলি কিছু বলার আগেই দরজার বাহির থেকে পিসিমা পুঁটলিকে ধমকে উঠলেন। পিসিমার বকা খেয়ে শেফালী দৌঁড়ে পালাতেই কাপড়ের আচল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে পিসিমা ঘরে এসে বসলেন। তার চোখ মুখ দেখেই স্পস্ট বুঝতে পারলুম, বাড়িতে কোনো এক ভয়ঙ্কর ভুমিকম্প হয়ে গেছে। যার ঝাকুনি হয়তো এক্ষুনি আমার গা’এ এসে লাগবে।

আমি আসন্ন বিপদকে গ্রহন করার জন্যি মনে মনে প্রস্তুত হয়ে জিজ্ঞাস করলুম, “পিসিমা তুমি কি কিছু বলবে?” পিসিমা অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলতে শুরু করলেন, “কমল, অনেক বড় মুখ করে তোর পিসামহাশয় তোকে কলকাতা থেকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তার সেই বড় মুখ বুঝি আর রইলো না’রে। আজ ব্রাহ্মন বাড়ি থেকে ব্রাহ্মণ’রা এসেছিলেন। তাঁরা তোর পিসাকে অনেক কথা শুনিয়ে গেল, আর বলে গেল তারা শিঘ্রই কুরচির বিয়ে ঠিক করেছেন। তুই যেন এতে কোনো বাঁধা না দিস। তুই যদি আর কোনো দিন কুরচির সাথে যোগাযোগ করার চেস্টা করিস, তাহলে তাঁরা গ্রাম্য বিচারের মাধ্যমে তোর পিসাকে গ্রাম ছাড়া করবে” বলেই পিসিমা আঁচলে মুখ চেপে হু হু করে মরা কান্না শুরু করে দিলেন।

তারপর একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কমল বাবু আবার শুরু করলেন-
সেইদিন পিসিমাকে শান্তনা দেওয়ার মত কোনো কথাই আমার জানা ছিল না। নত মুখে ঘর থেকে বের হয়ে গেলুম। সব বন্ধু-বান্ধবীদের সাথে যোগাযোগ করে জানতে পারলুম, কুরচিকে ঘরে তালাবন্ধী করে রাখা হয়েছে। তার সাথে কেহই দেখা করতে পারছে না। এর দুইদিন পর হঠাত করে কুরচিদের বাড়ি থেকে ঢাক-ঢোলের আওয়াজ শুনে বুঝতে পারলুম, কুরচির আজ বিয়ে। সেদিন আমি সারারাত তামাক খেয়েছিলুম। কলেজ মাঠের শেষ সীমান্তে কৃষ্ণতলায়, গাব গাছের প্রকান্ড শিকড়ে হেলান দিয়ে আমি যখন তামাক টানতুম, কুরচি তখন আমার হাঠুর উপর মাথা রেখে, আমার খোলা বুকের পশমে আঙুল দিয়ে কি যেনো আঁকিবুকি করতে করতে বলতো, "আমি যদি কোনোদিন তোমার পাশে না থাকি, তখন তুমি এমনি করে তামাক খাবে। তামাকের মৌ মৌ গন্ধে যখন আকাশ বাতাস ভরে উঠবে, তখন আমি বুঝে নিব তুমি আমাকে ডাকছো। আমি শাঁই শাঁই করে উড়ে পাহাড় পর্বত ভেংগে তোমার কাছে চলে আসব।"- সেই থেকে আজো অবধি প্রতিক্ষায় আছি, কিন্তু কুরচি আর কোনোদিন ফিরে আসলো না।
-আপনি কি তার সাথে দেখা করার চেস্টা করেননি?
-না করিনি। আমার জন্যে আমার সহজ সরল পিসা মশায়কে গ্রাম ছাড়া হতে হোক, তা আমি কখনো চাইনি। তাই দোতালার সেই চিলেকোঠায় দরজা লাগিয়ে, কুরচির বিয়ের পুরো তিনদিনের বেদনাকে আমি একা একাই উপভোগ করেছিলুম। সক্রেটিসের বিষের পেয়ালায় আকন্ঠ নীম্মজিত আমি, সমাজের গভীরে ডুব দিয়ে তুলে এনেছিলুম বৈষম্মের রক্তকরবী। যেদিন বিয়ের অনুস্ঠান শেষ করে কুরচি স্বামীর হাত ধরে শশুর বাড়িতে চলে গেল। সেদিন আমিও তাঁর স্মৃতির আঁচল গলায় বেঁধে চিরজীবনের জন্যে ঐ গ্রাম ছেড়ে দিলুম।
তারপর অনেকদিন এখানে সেখানে ঘুরে বেড়িয়েছি উদ্দেশ্য বিহীন। কিন্তু বাপু, এভাবে আর চলছিলো না, বুঝলে। হাতের পয়সাকড়ি যা কিছু ছিলো তামাকের ধুয়ার সাথেই উড়েগেল। তাই অনেক চেস্টা করে রেলওয়েতে সহকারী স্টেশন মাস্টারের একটি চাকুরী নিলুম। মহাদেবগঞ্জ স্টেশনে প্রথম পোস্টিং। সেখান থেকে ভাট ফুলের মত ভাসতে ভাসতে ত্রিশ বছরে অনেক জায়গা ঘুরে এই হাওড়া স্টেশনে আসলুম।
-তার মানে আপনি এখন এই হাওড়া স্টেশনের কর্তা বাবু? তাহলে বাইরে এই গাছতলায় বসে আছেন কেনো? না না কমল বাবু, এটা ঠিক নয়। চলুন আপনার অফিসে গিয়ে বসি, সেখানে এক কাপ চা খাওয়াবেন নিশ্চয়?
-না আদ্রি বাবু, ঐটা এখন আর আমার অফিস নেই। আজ দুইদিন হলো সেখানে এখন নতুন মাস্টার সাহেব এসেছেন, ঠাকুর নির্মল রায়।
বলেই কমল বাবু তাড়াহুড়ো করে পাশের বেঞ্চিতে রাখা ব্যাগটা নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে চলে যেতে যেতে বললেন,
-আমার আর সময় নেই আদ্রি বাবু। আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে, ট্রেন এসে গেছে। আর হে, আমার তামাক আর পাইপটিকে তোমার খুব পছন্দ, তাই না? এই নাও। এই বাক্সটি তোমার কাছে রেখে দাও। আমি এখন কোথায় কি অবস্থায় থাকি তার ঠিক নেই। তাই এগুলো তোমার কাছে রেখে গেলুম।

তুমি যত্নে রেখো। এই দেখ কথায় কথায় তোমাকে আবার তুমি করে বলে ফেললাম, তুমি আবার কিছু মনে করো না যেনো।

আমি অবাক হয়ে কমল বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে এত অল্প সময়ের ভিতর কি করে একটি মানুষ এত অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারে, ভাবতে ভাবতেই জিজ্ঞাস করলাম,

-আচ্ছা কমল বাবু, যাবার আগে আরেকটি প্রশ্নের জবাব দিবেন?

-আর কি জানতে চাচ্ছো? বলোতো হে।

-আপনি কি বিয়ে করেছেন?

-না।

-কেনো?

-কুরচির মত যদি আর কেহ তামাকের গন্ধ ভালো না বাসে, তাই।

বলেই হাসতে হাসতে মন্থর গতিতে চলে যাওয়া ট্রেনের হাতল ধরে, কমল বাবু ধীরে ধীরে মুছে যেতে লাগলেন আমার দৃষ্টির সীমানা থেকে। ট্রেনের চাকার কর্কশ ঘর্ষনকে ছাপিয়ে আমার কানে ভেসে আসতে থাকে শুধু একটি মাত্র প্রতিধ্বনী, "কুরচির মত যদি আর কেউ তামাকের গন্ধ ভালো না বাসে, যদি ভালো না বাসে, ভালো না বাসে"।

আমার শীতল হাতে নিঃশর্ত নির্জনে কমল বাবুর দিয়ে যাওয়া কারুকার্যপূর্ণ ছোট্ট কাঠের বাক্সটি খুলে দেখি, উটের হাড়ের লম্বা খাপে একটি কালো চকচকে পাইপ। যেনো কোনো একজন বিপন্ন মানুষের বিস্মৃত হৃদয়ের স্বপ্নহীন রাতের দীর্ঘশ্বাস। রূপার কৌটা ভরা কুরচি দেবীর দুঃখ্যমূল্যে কেনা সুসজ্জিত নির্মোহ ভালবাসা। তার নীচে সযত্নে ভাঁজ করে রাখা, কয়েকদিনের আগের লেখা কুরচি দেবীর একটি লেফাফা।

প্রীতিভাজুনেষু শ্রীকমল বাবু,

আপনার চরণ তলে জানাচ্ছি আমর সহস্র কোটি চোখের জলের প্রণতি। আমি জানি না কী করে আপনার কাছে ক্ষমা চাইবো। আমাদের মাঝে যা কিছু ঘটে গেছে তারজন্যে এখন আপনাকে আমার কি লেখা উচিত কিংবা আঁধো কিছু লেখা উচিত কিনা, বুঝতে পারছি না। আমি জানি আপনার সকল কস্ট গুলিকে আমার চোখের জলে ধুয়ে মুছে দেওয়ার মত সাধ্য এই জনমে আর হবে না। তবু লিখছি, না লিখে যে আমার আর কোনো উপায় নেই কমল বাবু।

স

কাল থেকেই আপনাকে সুন্দর একটি চিঠি লিখবো বলে ভাবছিলুম। কিন্তু সুন্দর সুখের যা কিছু ইচ্ছা তা দমন করার মধ্যেও বোধহয় এক ধরনের গভীরতর সুখ নিহিত থাকে। থাকে না? কি যে দেখেছিলাম আপনার ঐ মুখটিতে কমল বাবু। এত যুগ ধরে কত মুখইতো দেখলো এই পোড়া চোখ দু'টি। কিন্তু, কিন্তু এমন করে আর কোনো মুখ'এইতো আমার সর্বস্বকে চুম্বুকের মত আকর্ষণ করেনি। ভালো না বাসলেই ভালো..... বড় কস্ট গো ভালোবাসায়।

ভালোবাসাতো কাউকে পরিকল্পনা করে বাসা যায় না। ভালোবাসা হয়ে যায়, ঘটে যায়। এই ঘটনার অনেক আগের থেকেই মনের মধ্যে প্রেম পোকা উড়তে থাকে। তারপর হঠাত'ই এক সকালে এই দুঃখ সুখের ব্যাধি দূরারোগ্য ক্যান্সারের মতই ধরা পড়ে। তখন আর কিছুই করার থাকে না। অমোঘ পরিনতির জন্যে অশেষ যন্ত্রনার সংগে শুধু নিরব অপেক্ষা তখন। কেউ যেনো কাউকে ভালো না বাসে। জীবনের সব প্রাপ্তীকে এ যে অপ্রাপ্তীতেই গড়িয়ে দেয়। তারসব কিছুই হঠাত মূল্যহীন হয়ে পরে। হুস থাকলে এমন মূর্খ্যামী কেউ কি করে, বলেন? সে জন্যেই বোধহয়, হুসের মানুষদের কপালে ভালোবাসা জোটে না। যারা হারাবার ভয় করে না কিছুতেই, একমাত্র তাঁরাই ভালোবেসে সব হারাতে পারে। অথবা অন্যদিক দিয়ে দেখলে মনে হয়, যাকিছুই সে পেয়েছিলো বা তাঁর ছিলো, সেই সমস্ত কিছুইকেই অর্থবাহী করে তোলে ভালোবাসা। যে ভালোবাসেনি তাঁর জীবন বৃথা। তবুও বড় কষ্ট গো ভালোবাসায়।

আমার বিয়ের আগে আপনার সাথে সম্পর্ক ছিল মাত্র দু'বছরের। বিয়ের পর সেই সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে আপনি হয়ে গেলেন আমার সারা জীবনের। গোবরাবাগ থেকে চলে যাওয়ার পর কোথায় না খুঁজেছি আপনাকে? যখনই সুযোগ পেয়েছি, তখনই ঠাকুর হরিপদ রায়কে সংগে নিয়ে সারা কলকাতা আপনাকে খুঁজে বেড়িয়েছি। খুজে কি আর মানুষ পাওয়া যায়?

ঠাকুর হরিপদ রায়'এর কথা শুনিয়া ভ্রু যুগল নিশ্চয় কিঞ্চিত বাঁকা হইয়া গিয়াছে। অত্যন্ত ভালো গোছের মানুষ ছিলেন এই ঠাকুর হরিপদ রায়। যাহার সহিত সাত পাঁকে পাক খাইয়া ভগবানকে স্বাক্ষী রাখিয়া জীবন মরণ এক সাথে কাটানোর ওয়াদা করেছিলুম। বিবাহের প্রথম রাতেই আমি তাহাকে আপনার কথা খুলিয়া বলিলুম। তিনি আমার কথা শুনিয়া আপনাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার ওয়াদা করিলেন। কিন্তু ঠাকুর হরিপদ রায়'এর ওয়াদাতে বোধহয় কিঞ্চিত খুঁত ছিলো। তাহা না হইলে বিবাহের মাত্র তিন বছরের মাথায় নির্মলকে গর্ভে রাখিয়া, তিনি জীবন দুয়ারে কপাট লাগাইবেন কেনো?

সেই হইতেই শ্বশুর বাড়ির 'ভাতারখাকি' নাম নিয়া পিতৃকুলের পতিত ভিটায় আস্রয় নিলুম। যে পিতা মহাশয় অনেক গর্ব করিয়া বংশের কুল রাখিতে, ঠাকুর হরিপদ রায়'এর আস্তিনের সাথে আমার আঁচলের গিঁঠ বাঁধিয়া কন্যাদায় হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন, তিনিও বোধহয় আমাকে সাদা কাপড়ে দেখিয়া অকালেই চক্ষু মুঁদিলেন।

তখন থেকেই জেঠা মহাশায়ের উচ্ছিস্টে নির্মলকে কোনো মত লেখা পড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়াছি। সে এখন বি, কম, পাশ করিয়া ঘরে বসিয়াছে। কিন্তু আমার যে আর চলছে না কমল বাবু। মরা'র আগে উইল করে বাবা কিছু জমি লিখে দিয়ে গেলেও নির্মলকে পড়ালেখা করাতেই তা শেষ হয়ে যায়। এখন সারাদিন জেঠিমার সংসারে ঝি'এর কাজ করিয়া, দিনান্তে ঘরে ফিরে মিলাতে চেস্টা করি জীবনের নস্ট পান্ডুলিপি। বড় কস্ট গো এই জীবন...থাক সে সব কথা। কিন্তু থাকবেই বা কেনো? আপনি ছাড়া যে আমার আপন বলতে আর কেহ নেই গো কমল বাবু। আপনাকে বলবো বলেই স্মৃতির সুকেসে থরে থরে সাজায়ে রেখেছি আমার তেঁতত্রিশ বছরের না বলা সব কথা।

অনেক বছরপর গত পরশু হঠাত করেই, আপনার বন্ধু জয়দেব বসুর সাথে দেখা হইয়া গেলো। তার কাছ থেকেই জানিতে পারলুম, আপনি এখন হাওড়া স্টেশনের বড়কর্তা। তাই কোনো উপায়ন্তর না দেখিয়া, লজ্জা শরমের মাথা খাইয়া নির্মলকে এই পত্র সমেত আপনার কাছে পাঠাইয়া দিলুম। এই ভাবিয়া যে, রেলওয়ে কোম্পানীতে ওর একটি ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিবেন।
আমাকে আপনি ক্ষমা করিয়া দিবেন ঠাকুর। এই ঝাপসা চোখে এক নজর আপনাকে দেখিবার বড় ইচ্ছা থাকিলেও শরীরের সামর্থ্যে কুলাইবে না বলিয়া আসিতে পারলুম না। যদি পারেন একবার দেখা দিয়া তেঁতত্রিশ বছরের তৃষিত এই চোখ দুটিকে ঠান্ডা করিয়া যাইবেন। তাহা না হইলে যে চিতার আগুনেও এই চোখ দুইটি পুড়িবে না গো.....

প্রণামান্তে
আপনার কুরচি , ১৫ মাঘ, ১৩৬৬।

চিঠিটি পড়ে আমি কমল বাবুর দেওয়া পাইপটি ঠোটে ঝুলিয়ে, টানতে টানতে ধীর পায়ে স্টেশন মাস্টারের রুমে ঢুকতেই, এক ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠলেন-
-এই যে মশাই, এখানে ধুমপান নিষেধ। দয়া করে বাহিরে গিয়ে টানুন। উফফ কোথ্যেকে যে আসে..... যত্তসব!
আমি লজ্জায় পাইপটি নিভিয়ে দিয়ে একটু ইতস্তঃত করে জানতে চাইলাম,
-আপনি কি নির্মল বাবু? I mean ঠাকুর নির্মল রায়?
ভদ্রলোক বিরক্তির সুরে ভ্রু কুচঁকে জবাব দিলো,
-দেখুন মশাই, টিকেট নিতে চাইলে বাহিরে গিয়ে কাউন্টারে লাইন দিন। পরিচয় দিয়ে লাইন ছাড়া এখান থেকে টিকেট পাওয়া যায় না, বুঝেছেন?
আমি নতমুখে ঘর থেকে বের হয়ে আসতেই মধ্যবয়সি এক পয়েন্টস ম্যান কাছে এসে জানতে চাইলো,
-বাবু কোথায় যাবেন বলুন তো?

-না কোথাও না। আচ্ছা আপনি কি এখানে কমল ব্যানার্জী নামে কাউকে চিনেন?
-তিনিতো এখানকার বড় কর্তা বাবু ছিলেন হে। কিন্তু এখনতো তিনি এখানে নেই মহাশয়, গত কয়েকদিন আগে তিনি চাকরী ছেড়ে দিয়েছেন।
-কেনো, চাকুরী ছাড়লেন কেনো?

-তাতো বলতে পারলুম না বাবু। তবে শুনেছি নির্মল বাবুর জন্যে অনেক চেস্টা করেও কোনো চাকরীর যোগার করতে না পেরে, তিনি নিজের চাকরী ইস্তফা দিয়ে সেখানে নির্মল বাবুকে আত্মীয় পরিচয় দিয়ে ডুকিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন তিনি অসুস্থ, তার পক্ষে কাজ করা আর সম্ভব নয়। আসলে সব মিথ্যে কথা বুঝলেন হে। কর্তা বাবু যে কেনো এমন করলেন কিছুই বুঝতে পারলুম না, বড় কর্তা..

গঢ় গঢ় করে বলে যাওয়া পয়েন্টস ম্যানের আরো অনেক কথা..... কিছুই শুনতে পায় না আদ্রি। হঠাত করেই সব কিছু বড় এলোমেলো লাগে তার। কিছুক্ষন আগেও শ্রীকমল বাবুর এ্যারোমেটিক ম্যাগনোলিয়া তামাকের কুন্ডুলিকৃত ধোঁয়া যে সুগন্ধি ছড়িয়েছিলো চারিদিকে, সেই ধোঁয়াকে এখন এঁদো কুয়ার মাঝে ভাসমান শুকনো পদ্মের এক ঝাঁঝালো তীক্ত গন্ধের মত লাগে। আদ্রি মিলাতে পারে না কিছুই। কমল বাবু এ কাকে তার জীবনের সব টুকু ঢেলে দিলো? একি শুধুই প্রেমের প্রতিদান? নাকি ভালোবাসার চরণে জীবনের শেষ সম্বলটুকু উপুর করে দিয়ে তৃপ্তির ঢেকুঁর?

কমল বাবুর চলে যাওয়া পথে আদ্রির পাংশুটে চোখে উড়ে অসংখ্য ধূসর মৃত প্রজাপতি। আনন্দ বেদনার সন্ধিক্ষনে দাঁড়িয়ে মিলাতে চায়, পাওয়া না পাওয়ার ভাগফল। মিলে না কিছুই, একাকী বিকেলের রক্তিম আভায় শুধু অবশিস্ট থাকে, সবটুকু সৌন্দর্য্যের কারুকার্য দিয়ে গড়া একটি মুখ। খুব জানতে ইচ্ছে করে, রিতা তুমি কেমন আছো?

কাওসারের কার্টুন

কৌতুক

ওমর খৈয়াম এর ভাষায় বলতে চাই "অনিত্য এই ধারায় জেনো,কিছুই বড় টিকবে না
ভালবাসাই হেথায় শুধু অমর হয়ে থাকতে পারে..."

সবাইকে ভালবাসা দিবসের শুভেচ্ছা ।

গল্প

একটি প্রেমের সমাধি অথবা অজ্ঞতার অন্ধকার

শৈলার জুলিয়ান সিদ্দিকী

.....রাহাতের হাতের পাশেই দেওয়ালে ঝুলানো ফোনের রিসিভার হাতে নেওয়ার আগে সে বললো, হামিদের ফোন! তারপর রিসিভার তুলে কানে লাগিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ করে মাউথস্পিচে হাত চাপা দিয়ে বললো, হামিদের পক্ষিক্ষ!.....

।১।

সেবার প্রোজেক্ট শেষ হয়ে গেলে আমাকে ফেরত পাঠানো হলো হেড অফিসে। সেখানে যাওয়ার পর পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে সঙ্গে নতুনদের সঙ্গেও বেশ ভালো সখ্য হয়ে গেলো। এ ব্যাপারটা আমার কাছে বেশ মজার আর অদ্ভূত বলে মনে হয়। অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক হতে যেমন সময় লাগে না, তেমনি সম্পর্কহীনতায় পৌঁছুতেও কোনো কার্য-কারণের প্রয়োজন হয় না। অবশ্য এ নিয়ে আমার ভেতর তেমন বিরূপ কোনো দ্বন্দ্বের জন্ম হয় না বলেই হয়তো সম্পর্কের টানাপোড়েনে বিব্রত বোধ করি না কখনো।

তার কিছুদিন আগেই আমার লেখা একটি উপন্যাসকে ইমেজ আকারে এইচটিএমএল হিসাবে প্রতিটি পেইজে লিঙ্ক দিয়ে একটি ডিজিটাল বই বানিয়ে সিডিতে সংরক্ষণ করেছিলাম। প্রত্যাশা ছিলো কোনো মাল্টিমিডিয়া ম্যাগাজিনে প্রকাশের ব্যবস্থা করবো। কিন্তু তা আর হয়নি। আমার ডিজিটাল বই আলোর মুখ দেখতে না পেলেও অফিসের নিচতলা থেকে উপর তলা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো সে খবর। মিনু আপা ধরে বসলেন, সিডিটা দে পড়ি!

বললাম, আপা, আপনি পড়ে খারাপ ভাবতে পারেন!

বাদ দে! পড়তে পড়তে বুড়ো হলাম, কোনো বই বাদ রাখি নাই! আর লেখা তো লেখাই, ভালোমন্দ কোনো একটা বিশেষণের জন্যই তৈরী হয়!

অগত্যা আমাকে কথা দিতে হয়।

তার ঠিক দুদিন পরই হামিদ বললো, নাজিয়া কইছে তারেও দিতে হইবো!

আমি অবাক হয়ে বলি, এইটা আবার কে?

বুঝেন না কে? বলে, দাঁত বের করে হাসে সে।

পাশ থেকে দেওয়ান ভাই বললেন, অহনো বুঝবার পারস না? ভাশুরের নাম লইতে শরম পাইতাছে!

তাইলে ঘটনার মারেফত এইখানে! আমি হঠাৎ হেসে ফেলি।

তখনই হামিদ প্রায় ফিসফিস স্বরে জানালো, দুই-চাইরদিন পরে আইতাছে! আপনের লগে কথা কইবো।

শৈলার: জুলিয়ান সিদ্দিকী

নিজের সম্পর্কে: নিজের সম্পর্কে বলার মতো তেমন কোনো অর্জন নেই। ব্যক্তি হিসেবে আমি বেশ কৌতূহলী। মানুষ সম্পর্কে আগ্রহ বেশি। মানুষের ভিতরকার মানুষটিকে জানতে অনেক সময় ব্যয় করে ফেলি। চেষ্টা করি তা লেখায় ফুটিয়ে তুলতে। ঘৃণা করি রাজাকার, কপট মানুষদের।

ভালবাসেন: ভালোবাসি অনেক কিছু। আমার পরিবার-পরিজন, দেশ, তার প্রকৃতি। ভালোবাসি লিখতে, পড়তে। ভালোবাসি প্রিয় মানুষগুলোর দুঃসময়ে কাজে লাগতে। তাদের সঙ্গে সময় কাটাতে।

প্রিয় ব্যক্তিত্ব: আমার বাবা। আমার শিক্ষক ও দার্শনিক সিদ্দিকুর রহমান (প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক গুমতা হাই স্কুল), মাওলানা ভাসানীসহ আরো অনেকেই।

অবসরে: ঘুমাই।

বর্তমানে: সউদি আরবের একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত।

প্রিয় বাণী: লাইগ্যা থাকিস, ছাড়িস না! (কোনো এক পাগলের উক্তি, বাবার মুখ থেকে শোনা)

বলি, গিট্টু বানছে তর লগে, আমার লগে কথা কিসের?
হ্যায় গল্প পড়তে খুব পছন্দ করে। কালা লেখা পাইলেই হয়! আপনের কথা কইছিলাম!
আমার লগে কথা কইলে তো প্রেমে পইড়া যাবেরে! পরে না আবার তর শত্রু হই!
প্রেম হইলে হইবো! লেখক মানুষের লগে প্রেম হওনটা খুব বেশি দোষের না!
ব্যাপারটা আমার ভালো লাগে না। কারো সঙ্গে নতুন সম্পর্ক পাতাতে আমার আগ্রহ নেই বলা ঠিক হবে না। কিছুদিন পর সম্পর্কটা পানসে হয়ে যায় নয়তো ভেঙে যায় বলে উৎসাহ পাই না।
কালকে কেন আসতাছে?
হুনলেন না, আবুল স্যার কি কইলো?
তা তো শুনছিই।
ইন্টারভিউ লইবো।
আর ইন্টারভ্যু! পক্ষি দেখতে কেমন? সুইট হইলে উক্কে!
সোন্দর আছে!
হুম!
কিছুক্ষণ পরই ফোন বাজে।
রাহাতের হাতের পাশেই দেওয়ালে ঝুলানো ফোনের রিসিভার হাতে নেওয়ার আগে সে বললো, হামিদের ফোন! তারপর রিসিভার তুলে কানে লাগিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ করে মাউথস্পিচে হাত চাপা দিয়ে বললো, হামিদের পক্ষি!
হামিদ হাসে, ফাইজলামি করলে বেশি ভালো হইবো না কইলাম!
মিথ্যা হইলে আমি তরে কাবাব-নান খাওয়ামু! সত্য হইলে ডিপার্টমেন্টের সবাইরে তুই ভাজি-পরাটা খাওয়াবি!
হামিদ হাসতে হাসতে উঠে যায়। রাহাতের শর্তে সম্মত হয়েছে কিনা বোঝা যায় না।
কথা বলতে বলতে হঠাৎ আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে, জুলিয়াস সিজার! আপনের ফোন!
আমি অবাক হলেও তা প্রকাশ করি না। এগিয়ে ফোনের রিসিভার হাতে নিতেই হামিদ বললো, আপনের ভক্তের লগে কথা কন!
হামিদ চলে গেলে রিসিভার কানে লাগিয়ে বলি, বলেন!
আপনি আমাকে চিনতে পারছেন?
না! তবে অনুমান করতে পারতেছি!
বলেন তো!

হিসাব তো খুবই সহজ! যেহেতু হামিদের থ্রুতে কথা বলতেছেন তাইলে আপনি নাজিয়া হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি!
কথাগুলো খানিকটা জোরে জোরে বলছিলাম। নাজিয়া বললো, আপনার পাশে কেউ আছে?

পুরা ডিজাইন সেকশনের মানুষ!
ঠিক আছে, পরে কথা হবে। আর হ্যাঁ, সিডিটা হামিদ ভাইয়ের কাছে দিয়ে দেবেন। আজ রাখি!
রিসিভার রাখতে রাখতে মনে হলো, নাজিয়ার কণ্ঠস্বর বলছে, সে যথেষ্ট সুন্দরী! বিশ্রী গলার স্বর এমন কাউকে সুন্দর হতে দেখিনি।
সিটে এসে বসতেই, দোলন বললো, আধা মিনিটে কি কথা বললো?
বললাম, কথাবার্তা আসলে কিছু না! আমার লগে কানেক্ট হইলো আর কি!
তখনই আবুল হোসেন দরজা খুলে মাথাটা গলিয়ে দিয়ে বললেন, কি রাইটার, এত কথা বললে কাজ করেন কখন?
বললাম, আমার হাতের কাজ শেষ!
তাহলে অন্যদের কাজ করতে দেন!
আমাকে বাধ্য হয়ে মুখ ফেরাতে হয়।
আবুল হোসেন মাথা সরিয়ে নিতেই খট করে দরজা বন্ধ হয়ে গেলো। আর তখনই রাহাত বলে উঠলো, কুত্তা! পারলে সারাদিনই ঘেউঘেউ করে!
দোলন ফিসফিসে কণ্ঠে রাহাতকে বললো, বাইরে হয়তো কান পেতে আছে!
রাহাত একই স্বরে বলে, লুল তো কই নাই! অন্যরা লুল-লুচ্চা কইতে ডরায় না!
পরপর দুদিন আমাকে ফের প্রোজেক্ট অফিসে বসতে হয়েছিলো বলে নাজিয়ার কথা প্রায় ভুলতেই বসেছিলাম। তখনই রিসেপশন থেকে শান্তা ডেকে বললো, সিদ্দিকী ভাই, আপনার ফোন!
রিসিভার নিয়ে হ্যালো করতেই টের পাই নাজিয়া! বলি, আরে আপনি!
হুম! ফোন করেছি বলেই আমাকে মনে পড়লো!
ছিছি, কি বলেন! আপনার ইন্টারভিউ কেমন হলো?
ভালো।
জয়েন করছেন কবে?
নেক্সট উইকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেবে বলেছে।
তাহলে তো ভালোই।
আপনি ওখানে কি করতে গেলেন?
চাকরিটাই তো এমন?
ফিরছেন কবে?
আগামীকাল।
আচ্ছা, দেখা হবে।
রিসিভার রাখতেই শান্তা বললো, কে?
নতুন একজন, ইন্টারভিউ দিলো।
আপনারা কি আগের পরিচিত?
না। আগে একবার ফোনে কথা হয়েছে কেবল।

।২।
রোজার মাস এলেই আমার দুঃখ বেড়ে যায়। খাওয়া-দাওয়ার চাইতে সিগারেটের কষ্টটা খুব বেশি অনুভব করি। আড়ালে আবডালে খানা-পিনার কাজ চালানো গেলেও সিগারেটের ধোঁয়া আড়াল করা যায় না কোনোভাবেই। কিন্তু কী আর করা! নামাজের সময় যে পনের মিনিট বিরতি থাকে সে সময়েই এক দৌড়ে রেস্টুরেন্ট থেকে কিছু খেয়ে একটা সিগারেট টেনে ফিরে আসতে হয়। কোনো কোনোদিন বের হতে দেরি হয়ে গেলে আর খাবার পাওয়া যায় না। পাশের আরেকটা রেস্টুরেন্ট আছে, কিন্তু ওটাতে নাস্তা করা গেলেও সিগারেট টানা যায় না। তাই যোহোরের নামাযের সময় হলে উঠে পড়ি। তখনই নাজিয়া বলে উঠলো, আমিও যাবো!

কোথায়? আমি অবাক না হয়ে পারি না। কারণ আযানের সঙ্গে সঙ্গেই সে বাথরুম থেকে অযু করে এসে নামাযে বসেছিলো।

আপনার সঙ্গে যাবো! বলেই কেমন করে হাসে সে। লিপস্টিক না ছোঁয়ালেও পরিপাটি আর ঝকঝকে দাঁতের কারণেই হয়তো ঠোঁট দুটোকে বেশ জীবন্ত মনে হয়। মুখটা আরো লালচে দেখায়। হাসির ফলে গালে দুটো গর্ত ফুটে উঠেছে। এবার তার চোখে চোখ পড়লে আমার ভেতরটা কে যেন মুঠিতে চেপে ধরে। ঠিক যখন ভাববো যে, নাজিয়ার সৌন্দর্য অসাধারণ, তখনই কেন তার চশমার আড়ালে থাকা চোখে চোখ পড়লো? হায়! তার সব সৌন্দর্য যে ভাটা পড়ে গেল বাঁ চোখের সামান্য এ খুঁতটিতেই!

কেউ যখন সরাসরি তাকায় আর তার তা দেখলে যদি মনে হয় সে একই সঙ্গে দুটো জিনিসের প্রতি তাকিয়ে আছে, তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই অস্বস্তি লাগে। তাই আমার অস্বস্তি কাটাতে ছাদের দিকে তাকিয়ে আস্তে করে বলি, আমি যাবো খাইতে, আপনি কেন যাবেন?
আহা চলেন না! বলেই সে আমার হাত ধরে টানে। ব্যাপারটা দেওয়ান ভাইয়ের চোখে পড়লে তিনি বলে উঠলেন, তোমারে ছাড়াছাড়ি নাই! বাইন্ধা নিয়া যাবো!
নাজিয়া দেওয়ান ভাইকে বললো, কাউকে বলে দিয়েন না, প্লিজ!
আমরা বাইরে যাওয়ার সময় অন্যান্যরা কেমন অনিশ্চিত দৃষ্টিতে আমাদের দেখে।
কিছুটা পথ এগিয়ে গিয়ে নাজিয়াকে বলি, নামায পড়লেন অথচ রোজা থাকেন না, ব্যাপারটা খুবই অন্যায়!

রোজা থাকতে পারি না!

আপনি তো আর সিগ্রেট টানেন না! আমার সিগ্রেট হলেই পুরো ত্রিশ রোজা পার করে দিতে পারি!

নাজিয়া বললো, এত কথা বলেন না আপনি!

বলি, কথা না বললে মানুষে ভাববে আমরা অভিমান করেছি!
থামেন তো! বলার সঙ্গে সঙ্গে আমার হাতের কনুইতে হালকা চাপড় দেয় সে।
তার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা খুবই সহজ হয়ে গেলো কেবল এতটুকু পথ চলতে গিয়েই? আমি ভেবে পাই না, ব্যাপারটা এত দ্রুত কীভাবে ঘটা সম্ভব?
আমার ধারণা, মেয়েরা যেখানে নিরাপত্তা পায় সেখানেই খুব দ্রুত সহজ-সাবলীল হয়ে উঠতে পারে। এই নাজিয়াকে দিয়েই বুঝতে পারি। রোজার পুরো সময়টা সে আমার সঙ্গেই লাঞ্চ করতে গেছে। রোজা ফুরিয়ে গেলে লাঞ্চের সময়টা আমার জন্য অপেক্ষায় থাকে। আমার খাবার নাকি স্বাদ বেশি। একদিন বাসা থেকে ঘি দিয়ে রান্না করা ভূনা খিচুরি দিয়েছিলো রায়না। ব্যাপারটা জানা ছিলো না আমার। হটপট খুলতেই রুমের ভেতরটা কেমন মম করতে লাগলো। প্লেটে ঢালার আগেই সে তার প্লেট এগিয়ে দিয়ে বললো, রান্নাটা তো দারুণ!
খানিকটা তার পাতে তুলে দেই আরো খানিকটা তরকারি সহ। খাওয়ার পর সে বলে উঠলো, বাসার নাম্বার দেন, ভাবির সাথে কথা বলবো!

আমি সহজে রাজি হই না। কিন্তু সে গো ছাড়ে না। তখন বলি, চাইয়া দাওয়াত নিবেন না।
ঠিক আছে!

তখনই সে ফোনের কাছে যায়। ইন্টারকমে রিসেপশনে আমার বাসার নাম্বার লাগাতে বলে। আর কিছুক্ষণ পরই শুনতে পাই, ভাবি, কাল বেশি করে ভূনা মাংস আর খিচুরি দিয়ে দেবেন। নয়তো বাসায় চলে আসবো!
বসায় ফিরলে রায়না বললো, মেয়েটা কে?
বলি, দূরের কেউ না!
তাতো বুঝলাম, দিনভর এক লগেই থাকো! কিন্তু মেয়েটা করে কি?
আমার মতই কাজ করে।
তোমরা খুব মজা কর অফিসে, না?
মজা না করলে কি আর আমার খাবার অন্যে খায়?
মেয়েটার বিয়া হয় নাই?

বাচ্চা মেয়ে! বছর খানেক হইলো ডিপ্লোমা কইরা বাইর হইছে!
এভাবেই নাজিয়া আলাপের বিষয় হয়ে পৌঁছে যায় আমার সংসারেও। মাঝে মাঝে ফোনে কথাবার্তাও হয় দুজনে। এ নিয়ে নারী সুলভ কোনো প্রশ্ন করেনি বলে রায়নার ব্যাপারে খানিকটা দ্বিধায় ভুগি। ভেতরে ভেতরে কোনো গল্প বানাচ্ছে নাতো?

আমাদের নিয়ে আড়ালে আবডালে বেশ রসালো আলোচনা হয়। মাঝেমধ্যে বাইরে থেকে সেকশনে ঢুকলে অন্যান্যদের অপ্রস্তুত হতে দেখি প্রায়ই। এ আলোচনায় হামিদের খানিকটা হলেও সমর্থন আছে টের পাই। কিন্তু নাজিয়া বিশ্বাস করতে চায় না। ভেতরে ভেতরে আমি আসন্ন ভাঙনের শব্দ শুনি। নাজিয়ার চোখে কান্নার পূর্বাভাস দেখতে পাই অথচ সেগুলো নাজিয়ার কাছে প্রকাশ করতে পারি না।

আমাদের ঘনিষ্টতা হয়তো কারোর চোখেই ভালো লাগছিলো না। আহসান আলি একদিন বলেই ফেললো, নাজিয়া নির্ঘাত আপনার প্রেমে পড়ছে!

আমি বলে উঠি, এইটা কীভাবে সম্ভব?

নাজিয়া সেদিন ছুটিতে ছিলো বলে পরচর্চায় কারো মুখে লাগাম ছিলো না। আমার কথায় দেওয়ান ভাই বলে উঠলেন, তুমি আর মুখ মুইছো না! আমরা দেখলে কি বুঝি না? নুন দিয়া ভাত আমরাও খাই!

দেখেন, আমার বয়স আর তার বয়সের কত পার্থক্য সেইটা খেয়াল করেন না? আর সে যদি ভুল করে, আমার পক্ষে তো এমন ভুল করা সাজে না! আমার মত স্ত্রী-সন্তান আছে এমন পুরুষের পক্ষে এটা কেবল ভুল না, অপরাধও!

হ, হইছে! দেওয়ান ভাই ফের বলে উঠলেন, মনেমনে ডুবলে আর এইসব মনে থাকে না! তুমি অহনও ঠিক আছ দেইখ্যা এমন কথা কইতে পার!

সেদিনের মতো বিতর্ককে প্রশ্রয় না দিয়ে নিজের কাজে ডুবে গেলেও পরদিন অন্যান্যদের দৃষ্টিকে আমাদের দিকে ফেরাতেই হয়তো নাজিয়া সবার সমনে বলে উঠলো, সিদ্দিকী ভাই, আজ অফিস ছুটির পর আমার সঙ্গে আপনাকে যেতে হবে।

কোথায়?

নাজিয়াকে প্রশ্ন করলেও টের পাই সবার দৃষ্টি এখন আমাদের ওপর। তেমনটি না হলেও অন্তত উৎকর্ণ হয়ে আছে আমাদের কথোপকথন শুনতে। আমি ভেতরে ভেতরে শঙ্কিত হই এই ভেবে যে, নাজিয়া এমন কিছু না বলুক পরে যা নিয়ে এরা গল্প বানাতে পারে। তখনই সে বলে উঠলো, বনানী বাজার যাবো। এক রিকশায় যাবো আর আরেক রিকশায় ফিরে আসবো!

মনে মনে আমার কাঁদতে বাকি থাকে শুধু।

অফিস ছুটির পর বাইরে গিয়ে দেখি টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের অতিক্রম করে যাওয়ার সময় দেওয়ান ভাই কানের কাছে মুখ এনে বললেন, বিলাই পরথম রাইতেই মারতে হয়!

ব্যাপারটা দেখতে পেয়ে নাজিয়া বললো, কানেকানে বললো কি?

আমি কি তা বলবো? দেওয়ান ভাইয়ের ইঙ্গিতটা আরো নির্বোধও বুঝতে পারবে। কিন্তু নাজিয়াকে এ কথা বলে দেওয়ার অর্থ হবে নিজকে তার কাছে আরো ছোট করা। তাই তাকে বলি, আবুল হোসেন উপর থেকে আমাদের দেখছিলেন।

তাতে কি? এখন আমরা অফিস করছি না।

রিকশায় উঠলে আমার বেশ অস্বস্তি হয়। আরো অস্বস্তি হয় নাজিয়া যখন হুড তুলে দিতে বলে। আমি খানিকটা আপত্তি জানিয়ে বলি, এটা থাক না!

বৃষ্টিতে ভিজবো নাকি? লোকজন পাগল ছাড়া আর কিছু বলবে না!
আমি মিনমিন করে বলি, না, তা না! হুড তুললে সোজা হয়ে বসতে পারি না। মাথায় ঠুকুর-ঠুকুর করে এর বাঁশের চটার বাড়ি লাগে!
নাজিয়া তার বিভ্রান্ত দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠে বলে, এত লম্বু হইছেন কেন? মাথাটা বাসায় রেখে আসতে পারলেন না?
আমার আর কথা চলে না। বাধ্য হয়ে হুড তুলে দেই। আর তখনই সে রিকশা চালককে বলে, পর্দা নাই?

লোকটি জানায়, আনতে মনে নাই!
নাজিয়া আরো বিরক্ত হয়ে বলে, এখন বৃষ্টি বাড়লে পুরোপুরি ভিজতে হবে!
লোকটি রিকশা চালাতে চালাতে আকাশের দিকে একবার মুখ তুলে তাকিয়ে বললো, না আফা। হেই বিষ্টির লক্ষণ না। ডরাইয়েন না!

বনানী বাজার একটি মার্কেটের দোতলায় বাটা সু'র দোকানে ঢুকে নাজিয়া তার হ্যান্ডব্যাগ থেকে এক জোড়া মেয়েলী সেন্ডেল বের করে দোকানের লোকটির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, ভাই, বাটা কোম্পানি ফাঁকিবাজ হয়ে গেল নাকি? এক সপ্তাহ হলো না জুতো নষ্ট হয়ে গেল!
লোকটি বললো, ম্যামো এনেছেন?
নাজিয়া তার ব্যাগ হাতড়ে বাটা কম্পানির একটি ক্যাশ মেমো বের করে এগিয়ে দিলে লোকটি জানালো, সামনের সপ্তাহে আসবেন।
নাজিয়া অবাক হয়ে বললো, বদলে দেবেন না?
জি না আপা! ফ্যাক্টরিতে পাঠাবো। সেখান থেকে ঠিক করে দেবে।
আচ্ছা ঠিক আছে!

তারপর সে ফিরে আমাকে বললো, চলেন যাই! কিছু খাবেন?
আমি হেসে উঠে বলি, এভাবে বললে কি কেউ বলে যে, হ্যাঁ খাবো?
বলে তো! হামিদ ভাই যখন বলে, তখন তো আমি বলি, হ্যাঁ খাবো!
আপনি হামিদ আর আমি নাজিয়া হলে সমস্যা ছিলো না।

সে কিছুক্ষণ আমার দিকে তার দ্বিমুখি দুটো দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকে, কিন্তু কিছু বলে না।

৩

সেদিন বনানী বাজার থেকে ফেরার পর আমি কাকলী বাসস্ট্যান্ডে নেমে পড়ি। আর নাজিয়া রিকশায় করে চলে যায়। কিন্তু পরদিন তাকে অফিসে আসতে দেখা যায় না। তার পরদিনও না। আমি হামিদকে বলি, নাজিয়ার কি হইলো রে?

তা আপনেই না ভালো জানেন। এক লগে রিকশা দিয়া কই জানি গেলেন! তারবাদে হ্যায় না আইলে আমি কেমনে কই?

আমি কিছুটা ভাবনায় পড়ে যাই। তার সেলফোন নাম্বার আমার জানা নেই কথাটা কেউ বিশ্বাস করবে না। যে কারণে ভেতরকার উদবেগ চাপা দিয়ে রাখতে বাধ্য হই। লাঞ্চের সময় আমার কেন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে সব কিছু। খেতে ভালো লাগে না। হয়তো সে ছাপ আমার চেহারাতেও ফুটে উঠেছিলো। আর তা দেখেই হয়তো হামিদ বলে উঠলো, রান্দা ভালো হয় নাই?

না, ভালোই!

তয় চেহারা এমুন হইছে কেন?

কেমন?

এই যেমন কিছুই ভালা লাগতাছে না!

আমি সে কথার জবাব না দিয়ে জোর করে খেতে থাকি। যেন সবগুলো খাবার না খেতে পারলে আমার বিশাল কোনো ক্ষতি হয়ে যাবে। আর এভাবেই আমার খাওয়া শেষ হয়। হামিদ তাড়া দিয়ে বলে, শেষ করেন, কথা আছে!

হটপট আর প্লেট ধুয়ে মেজে গুছিয়ে নিতেই সে বললো, চলেন, আপনেরে আইজ সিগ্রেট খাওয়ামু!

বলি, আমার কাছে সিগ্রেট আছে।

তাও চলেন! সবখানে সব কথা কওন যায় না, বুঝেন না?

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হামিদ বললো, আমি খবর পাইছি নাজিয়া গেছে চিটাগাং।

কে আছে ওখানে? তার দিকে না ফিরেই জিজ্ঞেস করি।
কেউ নাই। ফেসবুকে আর্মির এক কেপ্টিনের লগে খাতির হইছে, তার লগে গেছে।
তুই এই খবর পাইলি কই?
খবর তো আর চাপা থাকে না! আমিও ঠিক করছি এই শালিরে আর বিয়া করমু না! বাইত্যে বাপ-মায় মাইয়া ঠিক করতাছে!
চাইর বছরের প্রেম পানসা হইয়া গেল? মাইয়া দেখতে কেমন?
নাজিয়ার থাইক্যা সোন্দর!
সোন্দর মানে কি জাপানি মূলা? তুই নিজে দেখছস?
আমাগো পাশের গ্যারাম।
রাস্তার এক পাশে ফাঁকা জায়গা দেখে দাঁড়িয়ে একটি সিগারেট ধরাই। তারপর বলি, তাইলে তার লগেই প্রেম করতি! নাজিয়ারে খারাপ করলি ক্যান?
শালি দুই দিকেরটা খাইতে চায়!
মহব্বত হইলো বিশ্বাসের ব্যাপার। অবিশ্বাসের ভিতর দিয়া কোনো সম্পর্ক টিকানো সম্ভব না।
তাইলে আমি মাইয়াগুলার নাম আইন্যা দিমু, আপনে জোড়া দেখবেন!
নাজিয়ার লগে তর জোড়া মিলে না কওয়াতে বলছিলি এইসব খনা-লীলার হিসাব ফালতু! বিয়া করলে এমনিতেই কর! আমি জোড়া দেখমু না!
আপনের ছোডো ভাই নাইলে ভুল কইরা একটা কথা কইছে, ভুইল্যা যান না কেন?
এরপর ঘটনাগুলো যেন হঠাৎ করেই কয়েকগুণ গতিশীল হয়ে যায়। আবুল হোসেনের সঙ্গে আমার তিক্ততা চরমে পৌঁছে গেল। হামিদের ঘ্যানর-ঘ্যানরে অতিষ্ঠ হয়ে তিনটি মেয়ের সঙ্গে তার জোড় পেয়ে গেলাম। তিনে ভালো। চারে উত্তম। পাঁচে অতি উত্তম। যে মেয়েটার সঙ্গে পাঁচ পাওয়া গেল, হামিদ বললো, তাইলে এইটার লগে বিয়া ঠিক করতে কই!
তর ইচ্ছা!

ঘটনা যে কতদূর গড়াবে তা হামিদ, নাজিয়া বা আমাদের কারোরই জানা ছিলো না। পরের সপ্তাহের শুরুর দিন অর্থাৎ শনিবার যথারিতী অফিসে গেছি, সেকশনে ঢুকেই দেখি কেমন থমথমে হয়ে আছে সবার মুখ। এদের মাঝে হামিদকে কিছুটা বেশি গম্ভীর দেখাচ্ছিলো। কেবল নাজিয়া হয়তো তখনো আসেনি। বললাম, ব্যাপার কি?
দেওয়ান ভাই হাসতে হাসতে বললেন, দামড়ায় তো ঘটনা সত্য সত্যই ঘটাইয়া ফালাইছে!
হঠাৎ তখনই হামিদ বলে উঠলো, নাজিয়ারে এখনই কিছু কইয়েন না!
কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। লাঞ্চের পরপরই কেমন করে যেন ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়লো। বাইরে থেকে সিগারেট টেনে সবে মাত্র সেকশনে ঢুকেছি, দেখি দুহাতে মুখ ঢেকে হুহু করে কাঁদছে নাজিয়া। আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, কি ব্যাপার?

নাজিয়া অকস্মাৎ কান্না ভুলে আমার দিকে ভেজা আর লালচে চোখ তুলে বলে উঠলো, সব কিছুর মূলে আপনি!
তারপরই আরো জোরে কেঁদে উঠলো সে।
মনে মনে আমি স্বীকার না করে পারি না যে, ঘটনার মূলে আমি নেই! লীলাবতীর সংখ্যাতত্ব নিয়ে এদের ওপর এক্সপেরিমেন্ট করাটা হয়তো ঠিক হলো না। হয়তো মেয়েটার প্রতি অবিচারই করলাম শুধু! বিয়ের পর মেয়েটা কষ্ট পেলেও এখনকার এ দৃশ্যটুকু অন্তত দেখতে হতো না আমাকে। আর এসব ভাবতে ভাবতে সত্যিই নিজকে অনেকটা অপরাধী মনে হচ্ছিলো। যে কারণে হয়তো নাজিয়ার অভিযোগের প্রতিবাদ করতে পারিনি। পারিনি তার হৃদয় ভেঙে খানখান হয়ে যেতে দেখেও সামান্যতম সান্ত্বনা দিতে।

২৯-১-২০১১
সউদি আরব।

কবিতা

জাগতিক সমীকরণ

শৈলার রাজন্য রুহানি

কর্মকান্ডে নিচে ফেলে দেখি
তুমি বউ হয়ে গেছ; দশ দিগন্তের
মায়া ছাড়ি এইবার, ধরি রংধনু ডানা–
মেঘপল্লবের বাতায়ন খুলে
উঁকি দিই
খুঁজে নিই
স্বর্গের সিঁড়ি বেয়ে উঠার মন্ত্রকৌশল,
যে রকম পরস্পর
নগ্ন হয় সুখি দম্পতিরা
কিংবা যে তাড়নায় জেগে ওঠে ঘুমন্ত মানুষ
প্রতিদিন...

বৃষ্টি নামে। স্বর্গের সপ্তম চূড়া থেকে
নামে আষাঢ়স্য আশির্বাদ। তবু
হুর-পরী থাকতে গেলমানের কী দরকার,
এই ভেবে লোভ বাড়ে বিড়ালের।

নিচের মানুষও একসময় উপরে ওঠে
জাগায় জাগতিক জীবন;
ধুর্, এমন হলে যে আভিজাত্যের বারোটা
বেজে যায়।
তারপরেও জোঁকের মুখে থুথু দিয়ে উঠে দাঁড়ায়
নিচের মানুষটি

চেয়ে দেখি–
বউ আমার কখন জানি স্বামী হয়া গ্যাছে।

লেখককথন: হাঁটতে হাঁটতে মগজ হাতড়ে দেখি--- অভিসন্ধির মানচিত্র হারিয়ে গেছে কোথাও। শুধু মনে পড়ে বাবার কথা; ছয়চোরের ঘরে বন্দি পাখিটির চোখেই কেবল আকাশ দেখা যায়। প্রযত্নের প্রবঞ্চনা ছাড়া জানা নেই চোরদের স্থাবর সাকিন, কোনোদিন পাখিটিরও দেখা পাবো কি-না--- এ আশঙ্কায় সামনে-পিছনের সমান দ্বন্দ্বে মাঝখানে ঘুরপাক খাচ্ছি অবিরাম। পাখিটির চোখে একবার চোখ রাখার প্রাণান্ত সাধ জিইয়ে রেখেছি অথচ!

অনুগল্প

মেঘ রঙা দিন

শৈলার রাবেয়া রব্বানি

((সে তার চোখ সরিয়ে নিল, শোওয়ার ঘরে ঢুকে গেল দ্রুত। লেখার টেবিলে বসে সিগারেট ধরালো। সকালের প্রথম সিগারেটে সে পর পর তৃষ্ণার্তের মত কয়েকটা টান দিল তারপর কবিতার খাতাটা নিল....

তুহিনের হাতে একটি পাঁচশ টাকার নোট। হঠাৎ মিষ্টি সুরে সেল্ ফোনটা বেজে উঠল তাতে ভেসে উঠা নামটা তার কাছে আরো মিষ্টি লাগল। সে টাকাটা যেখান থেকে নিয়েছিল ঠিক সেখানেই রেখে দিল।

-শুভ সকাল।

-শুভ সকাল পিউ। আকাশ দেখেছ? আজ মনে হয় একটা মেঘ রঙা দিন। বৃষ্টি নাও হতে পারে তবে দিনটা মেঘের রঙ মেখে বসে থাকবে। খুশি খুশি গলায় বলল তুহিন।
-হুম। তো এই উপলক্ষে জনাব একটা কবিতা বলেনতো শুনি।
তুহিন যেন তৈরিই ছিলো গলা খাকড়ি দিয়ে ভরাট কণ্ঠে আবৃত্তি শুরু করল
-"তুমি ভিজবে তোমার আমূল-সমূল? ভিজবে আমার সাথে?
ভীষণ রকম ভালবাসব, এসো হাঁটবে আমার পাশে।
দেখো মেঘ করেছে- মে-ঘ, গভীর কালো মেঘ"।

গানের লাইনগুলো কেমন হয়েছে পিউ?
-পরের লাইনগুলি শুনি?

-তিরতির করে কাঁপবে শরীর গভীর আলিঙ্গনে
ভেজা ঠোটে রাখব আগুন, ফাগুন তোমার মনে
তুমি আসবে তোমার আমূল-সমূল? আসবে আমার কাছে?
ভীষণ রকম ভালবাসব, এসো ভিজবে আমার সাথে"।
-হুম।

-কি হুম? বললেনা কেমন হয়েছে? নতুন লিখেছি।
-ভালো তবে একটু বেশি রোমান্টিক করার চেষ্টা করা হয়েছে আর কি। শুভ জন্মদিন! হেসে হেসে বলল পিউ।
-হুম তবে এইসব শুভকামনা আমার কাছে সবসময়ই মেকি লাগে। ইউ মে ডু সামথিং টু মেক দা ডে বিয়ুটিফুল মেম।
-হ্যালো তুহিন, আমি এখন রাখি।

ব্যস্ত ভঙ্গিতে ফোনের লাইন কেটে দিল পিউ। বীপ শব্দটা অস্থির ভাবে বেজে চলছে। তুহিন কিছুক্ষণ ফোনটা কানে ধরে রাখল। তার ঠোটে যে হাসিটা আসল তাতে পিউর প্রতি শ্লেষ কম নিজের প্রতি দুঃখই বেশি প্রকাশ পেল। পিউর এরকম হঠাৎ অনাগ্রহের সাথে সে পরিচিত কিন্তু আজ কেন জানি খারাপ লাগছে তার। জন্মদিনের এই দিনটাতে বাবা-মা মারা যাওয়ার পর আহ্লাদ করার কেউ নাই। পিউর কাছে আজ হয়ত সে দীর্ঘদিন না পাওয়া এই আহ্লাদটাই আশা করেছিল। ফোনটা রেখে দিয়ে তুহিন জানালার কাছে বৃষ্টির সম্ভাবনা বুঝার চেষ্টা করল তারপর টিভির সামনে এসে বসল। এমনিতে টিভির রিমোট কন্ট্রোল অন্যের হাতে থাকলে সে শান্ত হয়েই টিভি দেখে কিন্তু তা নিজের হাতে থাকলেই সে অস্থির বোধ করে। এলোমেলো ভাবে কিছুক্ষণ চ্যানেল পরিবর্তন করে আনমনে টাকাটার সামনে চলে আসল সে, সম্ভিত ফিরতেই সরে গেল আবার। সকাল দশটায় মতিঝিল থাকতেই হবে তার তাই নাশ্তা খেয়ে তৈ্রি হয়েই ছিল সে তবু আয়নায় নিজেকে আর একবার দেখে নিল, হাত ঘড়িটা খুজতে গিয়ে তুহিনের চোখ আবার টাকাটার দিকে গেল, টাকাটা যেন উপুর হয়ে শুয়ে আছে । এখন বাড়িতে কেউ নেই,তুহিনের ভাবীও বাচ্চাদের নিয়ে স্কুলে গেছে সেই হয়ত টাকাটা ভুলে ফেলে রেখে গেছে ভাবল তুহিন। অন্যমনস্ক হয়ে খাবারের টেবিলের উপর রাখা টাকাটা আবার ছুঁয়ে দিল সে। টাকাটার মাধ্যাকর্ষনের বলয়ে সে যেন বার বার আটকা পড়ে যাচ্ছে। সে ছোট্ট একটা শ্বাস ফেলে সরে গেলো।

মানুষের জীবনের প্রাপ্ত কষ্টের কিছু প্বার্শপ্রতিক্রিয়া আছে যা কিছু কিছু মানুষকে সারাজীবন অভিশাপের মত বয়ে বেড়াতে হয়,তুহিনের চৌর্যবৃত্তি স্বভাবটাও তেমন, যা থেকে সে প্রানপনে বেড়িয়ে আসতে চাচ্ছে। তার অভাব অনেক আগেই চলে গেছে তবু মাঝে মাঝে অভ্যাসবশত, মাঝে মাঝে পুরোনো রোগীর মত হাতড়ে বেড়ায়। টাকাটার কাছ থেকে সরে এসে তুহিন পিউর কথা ভাবতে চেষ্টা করল। কিন্তু কোন সুন্দর স্বৃতিই সে মনে করতে পারছে না। পিউর আজকের অনাগ্রহটাই যেন মোটা কালির মত ফুটে আছে আর সব লেখাকে ম্লান করে। এই বিশেষ কুপ্রবৃত্তি থেকে পালানোর জন্য সে সবসময় পিউর ভাবনাই মনে মনে পাহাড় সমান গড়ে আকড়ে ধরেছে কিন্তু আজ হাতড়ে ফিরে খড়কুটাও বানাতে পারছে না যেন। অবলম্বন না পেয়ে তুহিনের হাত আবারো নিশপিশ করতে থাকল। টাকাটা নেয়ার ইচ্ছা তাকে ভেতরে ভেতরে প্রবল বেগে ঝাকাতে থাকল। ঝড় থেকে সামলা্তে চাওয়া বৃক্ষের মতই সে দাড় করাতে চাইল তার নুজ্য মন। শরীরের ভেতর গোঙ্গানো একটি শব্দ কন্ঠ ঠেলে বেড়িয়ে আসল, -না!। খালি ঘরে কথাটি ফাঁকা গুলির মতই শোনাল। আবার ছেল ফোনটা পিউর নামে বেজে উঠল। কোন একটা ফাঁক গলে যেন অন্ধকার গুমোট ঘরটায় কিছু আলো ঢুকল। তুহিন চট করে তালা চাবিটা নিয়ে বের হয়ে গেল।

-হ্যালো পিউ, বল। তুহিন দরজা বাইরে থেকে লাগাতে লাগাতে বলল

-তুমি কি এখনো বাসায়?

-না। মানে বাসা থেকে বের হচ্ছি। কেন? তুহিন একটু দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে থমকে গেলো, তালা থেকে চাবিটা বের করল না।

-সরি আমি আজ আসতে পারব না। একটু ধীরে কথাটা বলল পিউ।
তুহিন শব্দ করে হেসে উঠল। তালা থেকে চাবিটা বের করে চাবিটা পকেটে নিলো,হাসতে হাসতেই বলল,

-জানিতো। এটা আর নতুন করে বলার কি আছে?
-মানে?

-মানে আমার ভাবী বলে তুমি আমারে হাঙ্গারে টাঙ্গায়ে রেখেছ, যখন খুশি বের করে পড়বে।
-তুহিন! তুমি এইভাবে বলতে পারলে। তুমি জানোনা আমার বাসায় প্রবলেম থাকে?
-হ্যা জানি। আর এটাও জানি প্রবলেমটা সবসময়ই থাকবে আর তোমার পরিবারে আমার গ্রহনযোগ্যতা কম। আমি সাধারন মাস্টার্স পাস, আমার টাকা থাকলেও আমি ব্যবসায়ি। আর তাছাড়া আমাদের জোড়ালো কোন কমিটমেন্টও নাই। তুমি চাইলে কাছে টানতে পারো, না চাইলে উড়াল দিতে পারো। এর মানে একটাই আমি হাঙ্গারে টানানো। হা হা।
-তুহিন আমি ভাবতাম তুমি আমাকে বুঝো।

-সরি পিউ আমিও ভাবতাম তুমি আমাকে বুঝো। আমি একতরফাভাবে বেশি আশা করে ফেলেছি কিনা এই মূহুর্তে ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে আমার আজকের বোঝাটা ভুলও হতে পারে। আর যদি ঠিক হয় তাহলে তুমি আর আমার কাছে এসো না।
উত্তেজনায় কথাটা বলেই নিজের অজান্তে ফোন কেঁটে দিয়েছে তুহিন। এত দিনের সম্পর্কে নিজেকে পিউর প্রতি কৃতজ্ঞই দেখেছে বরাবর। আজ তার নিজের ভেতর জমানো সংশয়,রাগ নিজেই দেখতে পেলো যেন। আবার ছেল ফোনের গুঞ্জন। তুহিনের বড় ভাই ফোন করেছে,
-হ্যালো ভাইয়া।

-হ্যালো তুহিন তুই আজকে এদিকে আসিস না। সাটার লাগায়া বসে আছি। বুঝলি।
-ও কে ভাইয়া। আপনি সাবধানে থাকবেন।

তুহিন সিড়ি ভেঙ্গে নিচে চলে এসেছিল এতক্ষণে। সে তার চলা থামিয়ে দিলো না, আস্তে আস্তে একটু এগোতে লাগল। এই সকালে বাসায় ফিরে যাওয়া ছাড়া অন্য উপায় খুজছে সে। বাড়ি ফেরার কথা মনে হতেই তার টাকাটার কথা মনে হলো। কি বিচ্ছিরি রোগ,মনটা আরো খারাপ হয়ে গেলো তার। তার নিজের এত মোটাসোটা মানিব্যাগটা থাকতে বেনামি পড়ে থাকা টাকাটা মোহনীয় ভঙ্গীতে মনে পড়ছে। কয়েকবার সাইক্রিয়াটিস্টের কাছে যেতে চেয়েছিলো সে লজ্জায় যাওয়া হয়নি। প্রতিবার ভেবেছে এইবার নিজেই শুধরে নিবো -এ আর কঠিন কি?সেই সাথে পিউর স্বপ্নও তাকে অনেকটা আত্মবিশ্বাসি করেছে এই ক্ষেত্রে। কিন্তু রোগটা যে রয়ে গেছে আজ বেশ টের পাচ্ছে সে।

-তুহিন একটু এগিয়ে মোড়ের দোকান থেকে সিগারেট কিনল তারপর বাসার দিকেই হাঁটতে লাগল। পিউ আর ফোন করেনি। রাগ করেছে হয়ত এই ভেবে তুহিনের এখন একটু খারাপ লাগা শুরু করেছে। পিউর থাকাটা তেমন জোরেসোরে না হলেও দীর্ঘদিন এই নিরব থাকাটাই এখন একটা অস্তিত্বে পরিনত হয়েছে। পিউ যদি সত্যি আর যোগাযোগ না করে সে কি পিউর এই একেবারে না থাকাটা সহ্য করতে পারবে? ভাবতে ভাবতে আবার দরজায় তালাচাবির মুখোমুখি হতে হল আর তালা খুলতেই টাকাটার সাথে চোখাচোখি হল তার। টাকাটাও যেন তার অপেক্ষায় তার দিকেই তাকিয়ে আছে,

সে তার চোখ সরিয়ে নিল, শোওয়ার ঘরে ঢুকে গেল দ্রুত। লেখার টেবিলে বসে সিগারেট ধরালো। সকালের প্রথম সিগারেটে সে পর পর তৃষ্ণার্তের মত কয়েকটা টান দিল তারপর কবিতার খাতাটা নিল। সাদা চকচকে পাতাটায় সুন্দর করে লিখল 'পিউ'। তার মনে হচ্ছে আজ সে পিউকে চিঠিটা লিখতে পারবে। চিঠিটা সে আগেও মনে মনে অনেকবার পিউকে লিখেছে কিন্তু পিউর এই আলগা হয়ে থাকাটা তাকে কখনো সাহসি করে তুলেনি তা খাতা কলমে প্রকাশ করার কিংবা পিউর এই না থাকার মত থাকাটা তার কাছে এত দামী ছিল যে তা হারানোর ভয় তাকে সাহসি করে তুলেনি এতদিন। আজ কেমন ক্ষ্যাপাটে বোধে সে লিখতে থাকল,

পিউ, কেন জানি তোমাকে কখনো চিঠি লিখা হয়ে উঠেনি। হয়ত দুরালাপনীর মেসেজ প্রথাই এর জন্য দায়ী। ছোট ছোট কথায় সব বলতে বলতে খুব বলতে চাওয়া একটা গল্প কখনোই বলা হয়ে উঠেনি। আজ তোমাকে সেই গল্পটাই খুব সাধারন ভাষায় বলব,

এই শহরে একটা ছেলে ছিল। সে খুব কম বয়েসেই তার বাবা-মাকে হারায়। সবচেয়ে ছোট ছেলে হওয়ায় তার পরবর্তি অভিভাবকগন তার মঙ্গল চিন্তায় অতিসচেতন হয়ে পড়ে ঠিকই তবে তার বাবা মার ভালোবাসার বিকল্প তেমন করে কেউ হতে পারে না।

শৈলার: রাবেয়া রব্বানি

রাবেয়া রব্বানি। ঢাকায়ই থাকি। অনেক ভাল লেখকদের লেখায় মুগ্ধ হয়ে টুকটাক লেখার চেষ্টা করি। ভালবাসি চাঁদ,বৃষ্টি,গল্প,কবিতা,গান আর ভালো মানুষের সান্নিধ্য। মানুষের চরিত্রের বিচিত্রতা ভীষণ ভাবে ভাবায়। মজার ঘটনা? অসংখ্য, লিখে শেষ করা যাবে না।

-যাতে নষ্ট না হয়ে যায় তাই তার হাতে টাকা প্রায় দেয়াই হত না।

ছেলেটিও তার প্রয়োজন সঠিক শব্দে তাদের বোঝাতে পারত না। তাই উঠতি বয়সে ছেলেটিকে দারুন অর্থকষ্টেও পড়তে হয়। অর্থহীন, ভালবাসাহীন সেই দুর্বল ছেলেটি গোপনে অনেক নিচে নেমে যেতে থাকে। অভাবের বিকল্প সে খুজে বেড়াতে থাকে কারো পকেটে,তোশকের নিচে,আলমারিতে। খুব বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে সরাতে থাকে বাজারের টাকা। এভাবেই প্রতিটি দিন একটু একটু করে আরো নিচে নামছিল সে। হঠাৎ একদিন একটি পরীর সাথে তার দেখা হয়ে যায়। পরীটার দিকে তাকাতে গিয়ে বুঝল সে কতটা নিচে।

পরীটাকে কাছ থেকে দেখার ইচ্ছা তাকে নিচ থেকে উপরে উঠাতে লাগল আবার। তার বয়স বাড়ল, অভিভাবকগনও তার প্রয়োজন বুঝতে পারল। পারিবারিকভাবে তার কাছে চলে আসল প্রচুর অর্থ আর সে নিজেও উপার্জন করল বেশ। কিন্তু ততদিনে অভাবের ছোবল জায়গামত বসে গেলো। প্রায়ই তাকে সেই পুরোনো প্রবৃত্তিটা তাড়া করতে থাকল, উপরে উঠতে চাওয়া মানুষটাকে নিচে নামিয়েই যেন সে ক্ষান্ত হবে। ক্লান্ত হয়ে একদিন সে পরীটিকে ডেকে বলল,

-আমার হাতটা ধরো। দেখছনা আমি নিচে পড়ে যাচ্ছি?

পরীটা কি বলল আমি জানিনা। পিউ তুমি আমার গল্পটা শেষ ও সুন্দর করে দাও।

-এতটুকু লিখে তুহিন খাতাটা দুরে ঠেলে দিল। আগের সিগারেটের শেষটা ফেলে আর একটা ধরাল। কেন জানি চিঠিটা লিখে তার হাল্কা লাগছে না নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসছে আরো। বুকের ঠিক মাঝখানে টনটন করছে কেমন জানি ব্যাথা। তুহিন ভূতে পাওয়া মানুষের মত উঠে দাঁড়াল, চিঠিটা ছিড়ে ফেলে ওয়েষ্টবক্সে ফেলে দিল তারপর ড্রইংরুমে গিয়ে টাকাটাকে মুঠো করে ধরল। তুহিনের ভেতর ভূতটা যেন পরম শান্তি পেল। ছেল ফোনের আর্তনাদে প্রেতআত্মাটা তাকে ছেড়ে দিল হঠাৎ। চমকে হাত থেকে টাকাটা পড়ে গেলো। পিউর ফোন,
-হ্যালো তুহিন তুমি কই?পিউর ব্যস্ত প্রশ্ন
-আমি বাসায়।

-আমি বাসে। এখন মাত্র উঠলাম, এলিফেন্ট রোডে আসতে আরো সময় লাগবে। যেই জ্যাম।
-কেন?তুহিন যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না।
-কেন আবার। আগে তোমার ঘর,তোমার লেখার টেবিলটা দেখবো তারপর দুপুরে বাইরে একসাথে খাব।
-পিউ সত্যি!

-হুম। এখন বাসে বোরিং লাগছে একটা কবিতা শোনাও কিন্তু জোড়ে বলবে শোনা যায় না।

কিন্তু তার নিজের লেখা কোন কবিতাই মনে পড়ছে না এখন। তার মনের ভিতর অনেক কথাই ঘুরপাক খাচ্ছে। তার খুব বলতে ইচ্ছে করল -আমি সেই অভিশপ্ত রাজকুমার পিউ যে মানুষ থেকে পশু হয়ে গেছি। তুমি ছুঁয়ে দাও আমি আবার মানুষ হব। কিন্তু কথাটা ঠোঁটে আনতে চাইলেই তা হারিয়ে গেলো। তুহিনের মাথা যেন পুরো শূন্য হয়ে গেছে। সে চোখ ছোট করে জানালা দিয়ে দুরের জিনিস দেখার চেষ্টা করল যেন দুর থেকে হারিয়ে যাওয়া কথা খুজে আনতে চাচ্ছে। অনেক খুঁজে তার মস্তিস্ক হাফিজের একটা কবিতাই খুঁজে পেলো। সে সেটাই কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে আবৃত্তি করতে থাকল,

" হিরনবালা তোমার কাছে দারূণ ঋনী সারা জীবন
যেমন ঋনী আব্বা এবং মায়ের কাছে
ফুলের কাছে মোমাছিরা
বায়ুর কাছে নদীর বুকে জলের খেলা যেমন ঋণী
খোদার কসম হিরনবালা
তোমার কাছে আমিও ঠিক তেমন ঋণী।"

.....

চলচ্চিত্র

প্রথম শ্রেণী থেকেই বিড়ালটি পুষতাম....

সাক্ষাত কার

প্রচারমাধ্যমে মুস্তফা প্রকাশ নামটি আর নতুন নয়। সম্প্রতি নটবর নটআউট ছবিতে অভিনয়ের সুবাদে তিনি এখন দুই বাংলায় অনেকটাই পরিচিত। শৈলীর কথা হয় মুস্তফার সাথে। ক্ষনিক আলাপচারিতায় খোলামেলাভাবেই আড্ডা দেন মুস্তফা প্রকাশ শৈলী প্রতিবেদক সাথে। তারই কিছু অংশ তুলে ধরা হল।

শৈলী প্রতিবেদক: কেমন আছেন?
মোস্তফা প্রকাশ: এই তো, ভালো।

শৈলী প্রতিবেদক: সিনেমাতে কিভাবে আসা?
মোস্তফা প্রকাশ:একদিন সকালে ফুল পেলাম। সেই ফুলে ছিল একটা ভ্রমর। ভ্রমরটি হঠাৎ করে বলে উঠল, এই তুই অভিনেতা হয়ে যা, ব্যাপারটা অনেকটা এমন করেই। আসলে আমি তখন বিজ্ঞাপনের কাজ করতাম। একদিন ডাইরেক্টর অমিত সেনের সাথে একটা কাজ করি, তখন তিনিই আমাকে সিনেমাটি করার প্রস্তাব দেন, যা ছিল সেই সকালের ফুলটির মতই সুন্দর।

শৈলী প্রতিবেদক: কেমন লাগছে এই মাধ্যমে এসে?
মোস্তফা প্রকাশ: নতুন আলো, নতুন সুন্দর। এই সুন্দর আলো যেন হারিয়ে না যায়, যেন বৃদ্ধি ঘটে উত্তোরত্তর।

শৈলী প্রতিবেদক: ছোটবেলা কি হতে চেয়েছিলেন?
মোস্তফা প্রকাশ: ঠিক মনে নেই। এখন যে কোন ভাবেই হোক অভিনয় জগতে প্রবেশ করেছি। আর সিনেমাতে তো হিরোরা তো অনেক কিছুই হতে পারে! হাহা।

চলচ্চিত্র

শৈলী প্রতিবেদক: মূলধারার সিনেমাতে অভিনয় করার কোন পরিকল্পনা?
মোস্তফা প্রকাশ : সুন্দর গল্প আমাকে অনেক বেশি টানে। অপেক্ষায় আছি, একটি সুন্দর গল্পের জন্য। যদি পাই সাদরে গ্রহণ করব।

শৈলী প্রতিবেদক: ছোট মিডিয়াতে ইচ্ছে আছে?
মোস্তফা প্রকাশ : কেন নয়? ছোট মিডিয়া থেকেই এসেছি। ওইটেই আমার প্রাণের ক্ষেত্র।

শৈলী প্রতিবেদক: আদর্শ ব্যক্তিত্ব কে?
মোস্তফা প্রকাশ:: বাবা

শৈলী প্রতিবেদক: কলকাতা চলচ্চিত্র ভার্সাস বাংলাদেশী চলচ্চিত্র?
মোস্তফা প্রকাশ:: সত্যি কথা বলতে, দুটি দেশের ভাষাগত মিল থাকলেও সিনেমার ক্ষেত্রে দুটি দেশই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল। বাংলা সিনেমার ভবিষ্যৎ আগত দিনে অবশ্যই আরও সমৃদ্ধশালী হবে।

শৈলী প্রতিবেদক: প্রথম চিঠি?
মোস্তফা প্রকাশ: আমার প্রথম চিঠি আসে চট্টগ্রাম থেকে ফ্যান হওয়ার অনুরোধ সম্পর্কিত। খুব সুন্দর করে গোল গোল হাতের অক্ষরে লিখা ছিল চিঠিটি।

চলচ্চিত্র

শৈলী প্রতিবেদক: প্রথম ভাললাগা?
মোস্তফা প্রকাশ:: ঠিক বলা সম্ভব নয়। জীবনে এতবার প্রেমে পড়েছি যে প্রথম ভাল লাগাকে আলাদা করে মনে করতে পারি না। যতদুর মনে পড়ে, একটি কালো বিড়াল, প্রথম শ্রেণী থেকেই সেই বিড়ালটি পুষতাম।

শৈলী প্রতিবেদক: ভালবাসা দিবস সম্পর্কে কিছু?
মোস্তফা প্রকাশ: দেখুন, আমি মনে করি, ভালবাসা সব সময়ের জন্য। কিন্তু একটা বিশেষ দিনকে উপলক্ষ করে যে কালচারটি গড়ে উঠেছে তা অবশ্যই বহু মানুষের কাছে অনেক আবেগ ও আনন্দের মিশেল, যেখানে এত আবেগ এত খুশি জড়িত, তার গুরুত্ব না থেকে পারেনা। আসুন আমরা সবাই ভালবাসার সাথে এই দিনটি যে যার মত যাপন করি!

শৈলী প্রতিবেদক: আপনাকে ধন্যবাদ।
মোস্তফা প্রকাশ: আপনাকেও। শুভ ভালবাসা দিবস সবাইকে।

গল্প

কথাসঙ্গীর বিহনে

শৈলার মামুন ম. আজিজ

((....মৃত্তিকা যেখানে হেলান দিয়ে কথা বলত, সেই পিলার টার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তরুন। ভীষন এক শূণ্যতা জড়িয়ে ধরে....

এমন যে হবে কখনও কি ভাবতে পেরেছে তরুন?

বালিশের পাশ থেকে মোবাইলটা হাতে নিয়ে দেখল রাত তিনটে। দুই ঘন্টা ধরে তীব্র যন্ত্রনা সহ্য করে শুয়ে আছে। এটা দ্বিতীয় প্রচেষ্টা। এর আগে একবার চেষ্টা করে বিফল হয়েছে। ঘুম আসেনি। সেই একই সমস্যা পুনঃ পুনঃ, ঠিক চোখ দুটো যখন ঘুমের নরম কোলে মুখ লুকাতে শুরু করে তখনই ভেসে ওঠে । একটা ঘর, মাঝারি আকারের। সাধারণত বেড রুম যেমন হয়, তেমন করেই সাজানো। খাটটা অবশ্য বেশ সুন্দর করে সাজানো। রঙিন রঙিন ফুলে শোভা পাচ্ছে। ফুলের গন্ধ গায়ে মেখে সেখানে শুয়ে আছে যে মেয়েটা তার চেহারা দেখার দরকার হয় না, মাথাটা ওপাশে আড়ালে তবুও চিনে ফেলে তরুনের প্রাণ, ওই তো মৃত্তিকা। দৃষ্টি নন্দন সাজ। কিন্তু তারপরই যত বিপত্তি। একটা মোচ ওয়ালা দীর্ঘদেহী লোক ফুলের বিছনাটার দিকে এগিয়ে যায়। ফুলগুলো মাড়িয়ে শুয়ে পড়ে, তার একটা হাত ধীরে ধীরে এগোতে থাকে লতার মত মৃত্তিকার চারু দেহ বেয়ে। সহ্য করতে পারে না। ঘূম টা ভেঙে যায়। একই কান্ড ঘুরে ফিরে বারবার। হয়তো ভঙ্গি আর দৃশ্যপটের স্ক্রিপ্ট একটু রদবদল হয়। থিম এবং চরিত্র প্রতিবারই একই রকম।

আর পারল না। লাভ নেই। কষ্টটা চাদর হয়ে মনটাকে মুড়ে দিচ্ছে। অসহ্য যন্ত্রনা বুকের ভেতর কোথাও অজানা প্রকোষ্ঠে উড়ে বেরাচ্ছে। হয়তো ওটাই মন কিংবা আত্মার পাওয়ার হাউস। উঠে এক গ্লাস পানি পান তারপর বারান্দায় গিয়ে আঁধারটাকে আপন করে নিয়ে বসে পড়ল তরুন। গাঢ় আঁধার গ্রীলের ওপাশে। চাঁদ তো নেই, নেই কোন তারাও। এ যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ নিঃসঙ্গতা। এই তো মাত্র দুটো রাত আগেও ঐ তো ঐ দুই হাত দুরের বারান্দাটায় দাঁড়িয়ে ছিল মেয়েটা। রোজকার রাতের অভ্যেস হয়ে উঠেছিল দু'জনার । কথা না বলে ঘুমাতে যাবে ভাবাই যেত না।

সারাদিনের টুকটাক কত কথা । কোথায় কোন রাস্তা-স্টপ মোড়ে কোন মেয়েটা দেখে তরুন মুগ্ধ হয়ে পিছু নিয়েছিল কিংবা কোন ছেলেটা মৃত্তিকার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ল্যাম্প পোষ্টে ঠকাস করে ধাক্কা খেলো এমন টুকরো টুকরো তুচ্ছ কথাও সব বলা হয়ে যেত। কথা শেষে মিষ্টি হাসির রেশ, তারপর একটা বেনসন আগুনে পুড়িয়ে ধোয়ার গলধকরণ, তারপর শান্তির ঘুম। সিগারেটটা সাধারণত ওর সামনে ধরানোই হতো না। নিষেধ ছিল। তবে এমনও হয়েছে মৃত্তিকা চলে গেছে ঘরের ভেতরে, তরুন তখন শেষ সিগারেটটা ধরিয়েছে আর তখনই দুষ্টুমি মাথায় নিয়ে আবার হাজির মৃত্তিকা। সিগারেটটা ফেলে দিতেই হয়েছে। ওটার মধ্যেও এক ধরনের মজা ছিল। ওমন ঘটনায় মাথার মধ্যে মেয়েটাকে বউ ভাবার মত ভাবনা যে আসেনি নিজের অন্তরের কাছে সে কথার অস্বীকার কেনো করবে তরুন। বলেও উঠেছে, মৃত্তিকা-

তুই যদি আমার বউ হতি তবে আমার সিগারেট খাওয়া পুরো বন্ধ হযে যেত নারে। মৃত্তিকা বলতো, বেঁচে গেলে ভাইয়া।

এত সখ্যতা। এত চেনা। বিশেষ করে রাতের প্রহর যত বাড়ে মানুষকে চেনার শতকরা হার নাকি বেড়ে যায়। তাহলে বিয়ের ঠিক চারদিন আগে যখনও বিয়ের কথা ৯০ ভাগ ঠিক হয়ে এই একটু ঝুলে আছে, মেয়ের সম্মতির সামান্য ফরমালিটিসটাই কেবল বাকী। ছেলে পক্ষ মেয়ের রূপ গুনে মুগ্ধ হয়ে আর হাতছাড়া করবেই না; শুক্রবারেই বিয়ে, তখনও তরুনের এই নির্ঘুম রাতের সন্ধান মেলে নি কেনো? এ কি অবিমৃষ্য ভাগ্য! মৃত্তিকা যখন এক নিঃশ্বাসে বলল, ভাইয়া আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, ওরা আর দেরী করবে না। দু পক্ষের সবাই একমত, আমি কিছু বুঝতে পারছিনা। ভাইয়া কিছু বলো।

তরুন খুব সংক্ষেপে বলেছিল, কনগ্রেটস।

ভাইয়া আমার বিয়ে আগামী শুক্রবারই হয়ে যাবে হয়তো। বুঝতে পারছ।
মৃত্তিকা কাঁপছিল। কান্না লুকানোর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া । তরুন আবারও ফান করছিল, কেমন রে বর? তুই মাটি আর বরটা তাহলে নিশ্চয় খাঁটি। শুনেছি , মা বলছিল অনেক ধনী নাকি তোর হবু বরে রা। খূব সুখে থাকবি, তাই না। আমারে মনে পড়বে না?
মৃত্তিকা আবারও বলল, তুমি কিছু বলবে না, কিছু বলবে না ভাইয়া, কিছূই কি বলার নেই।
আছে, বিয়েতে দাওয়াত দিস।

ভাইয়া , মা ডাকছে। রাতে কথা হবে।

সে রাতেও দুজন কথা বলেছিল। বিকেলে মৃত্তিকা বাবার কঠিন প্রশ্নে বিয়ের জন্য সম্মতি দিয়ে দিয়েছে, জানালো। কথা হলো পরের রাতেও। তারপরের রাতেও। কত দুষ্টামী। বিয়ে নিয়েও কিছু। মৃত্তিকা শেষ কটা দিন একটুও মিস করতে চায় নি। কেঁদেছে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ততক্ষনে অবশ্য তরুন সিগারেটটা ফেলে ঘরে চলে গেছে।

তরুন কখনও দেখেইনি। কখনও দেখেও না দেখার ভান করেছে। সামনে আসেনি কান্নার সুখ হতে মৃত্তিকাকে বঞ্চিত করতে। পরে কাঁদার চেয়ে আগে কাঁদাই তো ভাল। ভেবেছে ওমনই ।
মৃত্তিকা যেখানে হেলান দিয়ে কথা বলত, সেই পিলার টার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তরুন। ভীষন এক শূণ্যতা জড়িয়ে ধরে । ভীষণ চাপ সে শূণ্য আলিঙ্গনে। মনে হয় পাঁজরের ভেতরে কিছূ ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে প্রতিটি আলিঙ্গনে তার। অথচ বাহ্যিক পাঁজর অক্ষত। উঠে টেবিলের দিকে এগিয়ে সিগারেটের প্যাকেট টা পেল। দুটো আছে। চলবে। কিন' ম্যাচ নেই। ইস। প্রায়ই হয়। মৃত্তিকা বারন্দা থেকে কত ম্যাচের কাঠি ধার দিয়েছে। ছূড়ে মাড়ত। খালি কাঠি। ওটা মেঝেতে ঠুকিয়ে তরুন খূব ভাল ভাবেই আগুন জ্বালাতে পারে। হয়তো খুঁজলে বারান্দায় এখনও দু একটা কাঠি মিলবে।

মিলল সত্যি সত্যি। মেঝেতে একবারের ঘষাতেই আগুন জ্বলে উঠল। ধরালো সিগারেট। তারপরই মনে হলো এই বারুদের কাঠিতে মৃত্তিকার পরশ। খুব উপলব্ধি হচ্ছে এই দুদিন ভালবাসার সাথে স্পর্শের নিবীড় সম্পর্ক। শেষ যে দিন দু'জন কথা বলেছিল সেই নিশীথে গ্রীলের দুরত্বে সেদিন একটা অনুরোধ করেছিল মৃত্তিকা। 'ভাইয়া সিগারেট টা কম খেও আর পারলে এই আমার জন্য বাদ দিয়েই দিও।"

সিগারেট টা টানতে টানতেই ঢুলু ঢূলু চোখ বুজে আসছিল। ঠিক তখনই আবার সেই ফুলশয্যার খাট। লোকটার হাত মৃত্তিকার দেহের নানান ভাঁজে স্বপ্ন খুঁজে বেড়াচ্ছে। অসহ্য! পোড়া একটা গন্ধ এল নাকে । সিগারেটটা হাত থেকে পড়ে গেছে নিচে স্যান্ডেলের উপর। পুড়ছে। পানির গ্লাসটা টেবিল থেকে এনে ঢেলে দিল সাথে সাথে।

ঐ তো মনে পড়ে মৃত্তিকার বারান্দায় অসাবধানতা বশেই ছুঁড়ে মেরেছিল সিগারেটের অবশেষটুকু। পড়ল রশিতে ঝুলতে থাকা সেলোয়ারটার উপর। তারপর হঠাৎ ভয় পেয়ে গেলো তরুন। কিংকর্তব্যবিমূঢ়, বুঝছিল না কি করবে। এক গ্লাস পানি এনে ছুড়ে দিল। লাভ হলো না, আগুন ধরে গেছে, সেলোয়ারটা পুড়ছে, মৃত্তিকা বোধহয় শুয়ে পড়েছে। বাধ্য হয়ে মোবাইলে কল দিয়ে জাগাল। চোখে আগুন ধরা পড়তেই সে কি চিৎকার মৃত্তিকার। ওর মা ছুটে এসেছিল। ভীষণ লজ্জাকর কান্ড। তরুন সেদিন বাবার কাছে খুব বকা খেয়েছিল। মৃত্তিকা পরে বলেছিল, তুমি মোবাইলে বলতে পারলে না তুমি পুড়িয়েছ, তাহলে তো আর চিৎকার করি না। তুমি পোড়াবে তাও একটা সেলোয়ার! সে তো আমার সৌভাগ্য।
খোঁচা দিলি।

জি না। তুমি বুঝবে না।

সত্যি কি মেয়েটার মনটা পুড়িয়ে দিলাম। ও কি ঠিক এই আমার মত কষ্ট পাচেছ , নির্ঘূম কাটছে তার রাত? একটা কল দিলে কেমন হয়। সত্যি সত্যি নম্বরটা ডায়াল করল তরুন। বন্ধ। উহ্! নো। তারপর টিভিটা ছেড়ে সারা রাত কাটিয়ে দিল তরুন সিনেমা দেখে অথবা টিভির পর্দায় মৃত্তিকার চেহরা ভেবে ভেবে।

দিনে ভালই ঘুম হলো। মৃত্তিকা খুব একটা ঝামেলা করল না। দোকানে যাওয়া হলো না। জানে বাবা খূব বকবেন। তাদের বসুন্ধরার দোকানটাতে একজন কর্মচারী এমনেতেই ছুটিতে। গতকালও যায় নি তরুন। ক্যাশে কে বসবে। বাবা কটা দোকান সামলাবেন একা? অথচ সে নিয়ে তার কোন মাথা ব্যাথা হচ্ছে না। বাবা সকালে একবার ডেকে জিজ্ঞেস করাতে বলল, গায়ে জ্বর। সত্যিই গায়ে না হোক মনে তো জ্বর হয়েছেই।

সন্ধ্যায় মৃত্তিকার বউ ভাতের অনুষ্ঠান। তরুন গেলো না। বাবা, ছোট ভাই আর ছোট বোনটা গেলো। তরুনের মা বেঁচে নেই। বাসায় তাই একা তখন তরুন। সেই তীব্র একাকীত্বে মৃত্তিকার প্রতি প্রেম আরও ঝড়ো হয়ে উঠল। শেভ করার রেজার টা নিয়ে একবার মনে হলো হাতে একটা কৃত্রিম কষ্ট রচে দেখা যাক ঐ কষ্টটা কমে কিনা। কিন্তু উচিৎ হবে না। ভাবনা তবুও দুমুখিই চলতে থাকে। হঠাৎ কি ভেবে এক সময় একটা লম্বা টান দিয়ে দিল। রক্তের প্রবাহ মনে যেন কষ্ট আরও বাড়িযে দিল। রক্ত পড়ছে হাত বেয়ে, বসে আছে বারান্দায়। মন খুঁজছে মৃত্তিকার সঙ্গ। মৃত্তিকা হঠাৎ কানের কাছে এসে বলল, এসব কি? হুস হলো।

উঠে ওষুধ লাগিয়ে রক্ত বন্ধ করে তুলা দিয়ে ঢেকে রাখল। অনেকখানিই কেটেছে। নিজেই অবাক হলো। সেই শক্ত হৃদয়ের তরুন...এ কি হলো , কেনো হলো, কি যে হলো, জানি না তো ...গান টা আওড়ালো দুবার।

তারপর এলো সেই গভীর রাত। বারান্দাতেই বসে ছিল। অপেক্ষায় ছিল, কখন আসে মৃত্তিকা। রাত তখন সাড়ে দশ ঘটিকা হবে, ও এলো।
কেমন আছ, ভাইয়া। শুনলাম জ্বর। কিন্তু জ্বর নিয়েও আসা উচিৎ ছিল। আমি কিন্তু আশা করেছিলাম।

তরুন অবাক তাকিয়ে। কি অসাধারণ লাগছে মেয়েটাকে। কে বলবে দুদিন আগেও ও একটা ছোট্ট মেয়ে ছিল। সে ছোট্ট মেয়োটার সাথে সে গত ৭ বছর ধরে কথা বলে আসছে। তার সামনে এ যে এক পূর্ণবতী আফ্রোদিতি। ও মায়া বাঁচতে দেবে না তরুন কে। সে তাকিয়েই থাকল।
কিন' তোমার হাতে ... কি হয়েছে? দেখি দেখি,
কিছু না, কেটে গেছে।
কিভাবে, কিভাবে, বলো, বলো না।
রেজার লেগে, রেজার , কিন্তু তুমি তো দেখি দেবদাসের মত উদাস হয়ে দাড়ি টারি শেভ ই করনি।
ওই তো করতে যাচ্ছিলাম , হাতে হঠাৎ টান লেগে...আর শেভ করলাম না। তা তুই ভাল আছিস।
তুমি কিছু লুকাচ্ছ। মাত্র দুদিনে একি চেহারা বানিয়েছে। বলো তো কি হয়েছে?
কিছু না। তুই যা, তোর বর আবার খুঁজতে খূঁজতে চলে না আসে।

আসুক। ওকে আমি তোমার কথা বলেছি তো। একটু বয়স বেশী লোকটার। কিন্তু মানুষটা খুবই ভাল । আমাকে প্রচন্ড ভালবাসে। জানো আমার এক কথায় বাসর রাতেই তার আজীবনের সাধনার মোচটা কেটেই ফেলল। আমি বললাম মোচ না কাটলে নো কিস এটঅল, বাস...
তুই চুপ কর। চুপ করবি। যা চলে যা।

আচ্ছা কি বলোতো, কি হয়েছে, হিংসা হচ্ছে...কিন্তু কেনো হবে ...তুমি তো আর...
হিংসা! কার সাথে করব। ঐ মোচুর সাথে। তুই ওরে ছেড়ে দে। এখনও সময় আছে। তুই না আমার কাছ থাকে শুনতে চেয়েছিলি , আমি বলব। আমি আমি তোকে অনেক ভালবাসি। অনেক। তোকে ছাড়া আমার চলবে না।এখনও সময় আছে। চলে আয়, প্লিজ আমাকে বাঁচা।

মৃত্তিকা চুপ করে তাকিয়ে থাকল অনেক ক্ষণ। তারপর বলে উঠল, আমি এখনও তোমাকে অনেক ভালবাসি। বাসব হয়তো সারাজীবন। কিন্তু এখন আর কিছূ করা নেই। সেই আমি আর নেই । আমি অন্য কারও। সবই সঁপে দিয়েছি । সঁপে দিয়েছি অন্য একজনের ভালবাসার কাছে। তোমাকে দেয়ার মত কিছূ নেই আমার আর।

সমস্যা নেই। আমি সব মেনে নেব। মাত্র তো দুই রাত।
ওটাই তো যথেষ্ট। আমি আহাদকে মেনে নিয়েছি। ওই এখন দেহ মনের অধিকারী। আমি ওকে ভালবাসার চেষ্টা করছি। হয়তো পারবও । মেয়েরা সব পারে। পারতে হয়। এখন আর আমাকে কেনো দুর্বল করে দিচ্ছো।

আমি কিচ্ছু জানি না। আমি ভুল করেছি। আমি বুঝতে চায়নি। তোকে এত কাছে পেয়ে বুঝি নি হারানো বলে কিছু যে আছে। আমি সত্যি সত্যি তোকে ভালবাসি।
ভালবাসা! নাকি কথা বলার সঙ্গীর অভাব। কথাসঙ্গী !
ও অভাবটাকি ভালবাসার অভাব নয়?

চুপ করো। প্লিজ , চুপ করো। ও ডাকছে। এ দিকেই আসছে। তুমি চলে যাও ভেতরে। যাও। আমি এখন আর চাচ্ছিনা তোমার সাথে ওর কথা হক। পরিচয় হোক। আমি ওকে বলে দেবো তুমি বাসায় নেই কিংবা অন্য কিছু। আমি তো ওকে দেহ মনে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। তুমিই তো বাধ্য করেছ।

আচ্ছা করেছি। এখন বাধ্য করছি চলে আসতে। আস। ঐ লোকটা তোমার দেহ নিয়ে খেলবে তুমি একটু ও কষ্ট পাবে না আমার জন্য । তোমার জন্য। তুমি নিজের হাতে নিজের স্বর্গ নষ্ট করেছো। সব ভুলে যাও। কাজ কর মন দিয়ে। দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। আর তুমি ডাক তোমার কণ্ঠে বড় বেমানান লাগছে ভাইয়া। কিচ্ছু ঠিক হবে না। আমি সহ্য করতে পারিনা। ঘুমাতে পারি না। মচুটা তোমার দেহ স্পর্শ করছে আমি ভাবতে পারি না, ও দেহ আমার, আমার।

শোন তোমার রুমটা পাল্টে নিও। আমি আর কখনও এই বারান্দায় আসব না, অন্তত তুমি থাকলে। আমি দুঃখিত। চললাম।

কবিতা

তোমাকে চাওয়ার নিমিত্তে

শৈলার চারুমান্নান

সাঁঝের অমিয় আলোর ছোটা,খানিক স্বপ্ন বুনে !! কবিতার মায়া জালে,
আকন্ঠ নিমজ্জিত! মেঘের ডানায় ভাসে জীবন।

তোমাকে দেখে ছিলাম বলে আজো,
স্বপ্ন বেঁচে আছে !
তোমাকে চেয়ে ছিলাম বলে আজো,
ভাবনারা ছায়ায় বাঁচে !
স্বপ্নেরা মালা গাঁথে প্রতি নিশি রাতে, তোমাকে রাঙ্গায়
গোলাপী সাজে !
আর ভাবনারা তো আছে তোমাকে কথার ভাঁজে
মোড়ায়, স্বপ্ন সাথে মিলে ।

তোমাকে চেয়ে ছিলাম,
প্রাণের মত করে ! তোমাকে দেখে ছিলাম
চাঁদের উম্মাদনা জোছনায়,
বিলানো আলোর মত দেখে ছিলাম তোমায়
তাই তো ইচ্ছার লাগাম ছিঁরতে চায়
তোমাকে চাওয়ার নিমিত্তে ।

কবিতা

দ্বিতীয় মৃত্যু

শৈলার রকিবুল ইসলাম

এসো প্রিয়া তোমায় স্পর্শ করি একটি বার
নেই দ্বিতীয় মৃত্যুর স্বাদ; বার বার মৃত্যু
রূপ বদলায় নগ্ন প্রেমে; মোহময়ী মোহে
জীবনের স্রোত ঢেউ ভাঙ্গা গানের ভৈরবে
মৌবনে মৌমাছি খুঁজে হেমলক বিষ
তোমাকে ভালবাসি আমার ছলনার বোধে
তীক্ষ্ণ বিষ তীরের আঘাত লাগে বিষ্ণু বক্ষে
আবার প্রেমের ফোয়ারায় পাল তোলা নৌকা
তুমি আর আমি এক স্বত্তা; জীবন মরণে
প্রেমের ভুবন আলোকিত সৌরভে সাজাবো
নদের মোহে আসবে নদী চাতুরী বন্যায়
এসো প্রিয়া তোমায় স্পর্শ করি একটি বার
নেই দ্বিতীয় মৃত্যুর স্বাদ; তোমার পরশে --

লেখক পরিচিতি হাসান মোহাম্মদ রকিবুল ইসলাম, জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ থানার ভাংবাড়ি গ্রামে জন্ম। বর্তমানে উত্তরা পাবলিক কলেজ-এ বাংলা প্রভাষক পদে নিয়োজিত আছি। বই মেলা ফেব্রুয়ারি-২০১১ তে কবিতার বই "কবি ও কাফন" প্রকাশ হচ্ছে।

প্রবন্ধ

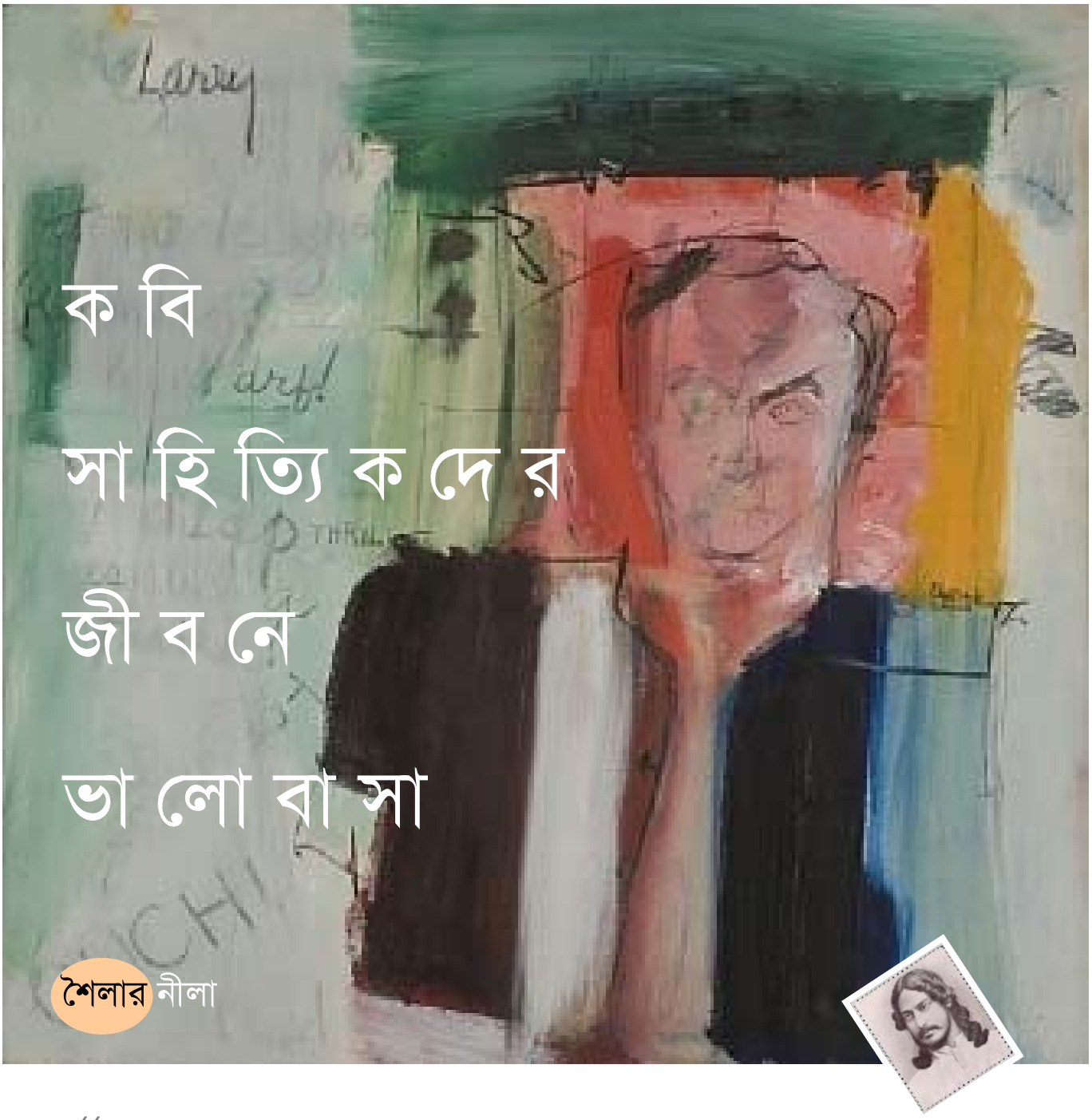

কবি সাহিত্যিকদের জীবনে ভালোবাসা

শৈলার নীলা

((আর সেখানেই স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায়ের সাথে প্রথম দেখা সুনীলের। প্রথম দেখাতেই ভাল লাগে স্বাতীকে, বাসায় ফিরে চিঠি লিখেন তাকে।

ভালোবাসা একটি মানবিক অনুভুতি, আবেগকেন্দ্রিক একটি বিশেষ অভিজ্ঞতা। জীবনের কোন না কোন পর্যায়ে কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতি স্নেহের সর্বোচ্চ বহিঃপ্রকাশের নামই ভালোবাসা। ভালোবাসা বিভিন্ন ব্যক্তির জীবনে বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয়। কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে নিজের সকল মানবীয় অনুভূতি ভাগ করে নেয়ার মত এমন ঐশ্বরিক আনন্দ হয়তো আর কিছুতেই নেই।

ভালোবাসা আবেগেরই বহিঃপ্রকাশ, আবার আবেগ থেকেই কবিতার সৃষ্টি, সাহিত্যের সৃষ্টি। বিখ্যাত সব কবি, সাহিত্যিকরা ভালোবাসা নিয়ে অনেক কিছুই লিখে গেছেন। সময়ে সময়ে সেগুলো জনপ্রিয়তাও পেয়েছে অনেক। কিন্তু সেইসব কবি সাহিত্যিকদের জীবনেও কি ভালোবাসা এসেছিলো? তারাও কি ঐ ঐশ্বরিক অনুভুতিতে বুঁদ হয়েছিলেন কখনো?? সেরকম-ই কিছু কথা নিয়ে আমার এই রচনা। বিখ্যাত কিছু সাহিত্যিকদের জীবনে ভালোবাসার স্বরূপ বিশ্লেষন-ই আমার উদ্দেশ্য। আমার পছন্দের কয়েকজন সাহিত্যিকের জীবনের সত্যিকারের ভালোবাসার কাহিনীই তুলে ধরা হলো এখানে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
ও
(কাদম্বরি দেবী)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম হয়েছিলো ১৮৬১ সালের ৭ মে কলকাতার এক বিখ্যাত ব্রাহ্মন পরিবারে। তিনি একাধারে বাংলার দিকপাল কবি, ঔপন্যাসিক, সংগীতস্রষ্টা, নাট্যকার, চিত্রকর, গল্পকার, প্রাবন্ধিক ও দার্শনিক। তিনি গুরুদেব, কবিগুরু ও বিশ্বকবি অভিধায় নন্দিত। ১৯১৩ সালে তিনি তার অত্যন্ত সংবেদনশীল বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'গীতাঞ্জলী'র জন্য সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।বাল্যবয়স থেকেই বিদ্যালয়ের বাঁধাধরা শিক্ষাব্যবস্থা কবিকে আকৃষ্ট করতে পারেনি।

স্কুলে যাওয়ার বদলে বালক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়িতে বা বোলপুর, পানিহাটি প্রভৃতি অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে ঘুরে বেড়াতেই বেশি পছন্দ করতেন। বাল্যবয়সে তার সবচেয়ে কাছের বন্ধু ছিলো তার বৌদি কাদম্বরি দেবী। কাদম্বরী যখন ঠাকুর পরিবারের বৌ হয়ে আসেন তখন কবির বয়স ৭ বছর। কাদম্বরী ও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রায় সমবয়সী। সেই থেকে রবীন্দ্রনাথের খেলার সাথী হলেন কাদম্বরী, এভাবেই দুজনের সখ্যতা একসময় ভালোবাসায় রূপ নেয়। রবীন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবীর সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে। ধীরে ধীরে তাদের এ সম্পর্ক সবার নজরে পড়তে থাকে, রবীন্দ্রনাথের বাবা তার জন্য পাত্রী দেখা শুরু করলেন। হঠাৎ করেই অপ্রত্যাশিত ভাবে রবির বিয়ে হয় ১১ বছর বয়সী ভবতারিনী দেবীর সঙ্গে, ৯ ই ডিসেম্বর, ১৮৮৩ সালে। পরবর্তীতে তার নাম পালটে রাখা হয় মৃনালিনী দেবী।

রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী ছিলেন খুবই সাধারন ঘরের মেয়ে, যার সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ কম ছিল, এক সময় রবীন্দ্রনাথের পরিবারের সদস্য জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর মাধ্যমে মৃনালিনী দেবীর সাথে পরিচয় ঘটে রবীন্দ্রনাথের। তিনি মৃনালিনী দেবীকে ইংরেজী শেখার স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। ঠাকুর পরিবারের বিভিন্ন রীতি-নীতি ও ঘরোয়া কাজে পারদর্শি হয়ে উঠেন মৃনালিনী। রবীন্দ্রনাথের বিয়ের কয়েকদিন পর জ্ঞানদানন্দিনী দেবী মৃনালিনীকে সত্যিকার অর্থে রবির যোগ্য স্ত্রী হিসেবে গড়ে তুলতে সমর্থ হন।

১৯ এপ্রিল, ১৮৮৪ সালে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে কলকাতার অনেক গন্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। জোতিন্দ্রনাথ সে অনুষ্ঠানে কাদম্বরিকে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ঝড়ের কারনে উনি আসতে অপারগ হন। এতে কাদম্বরি আরও অভিমানী হয়ে উঠেন। সেই অভিমান কাদম্বরীকে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে সহায়ক ভুমিকা পালন করেছিল। সেই অভিমানে কাদম্বরি দেবী রাতেই ঘুমের ঔষধ খেয়ে আত্মহত্যা করেন। কাদম্বরি দেবীর অকাল মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ মানসিকভাবে দারুন বিপর্যস্ত হয়ে পরেন। লেখা থেকেও দূরে ছিলেন অনেক দিন। তার এহেন দুরবস্থায় তাকে বৃক্ষের মত ছায়া দিতে থাকেন তার সুযোগ্য স্ত্রী মৃনালিনী দেবী। জীবনের সবক্ষেত্রে তিনি স্বামীর পাশে থেকেছেন। এমনকি কোলকাতার ঠাকুরবাড়ির প্রাচুর্য ছেড়ে কবির সাথে তিনি শান্তিনিকেতনে যেতেও পিছপা হননি। মৃনালিনী দেবীর ভালোবাসাই রবীন্দ্রনাথকে আগলে রেখেছিলো।

শৈলার: নীলা

নিজের কথা: পড়াশুনা করেছি ফার্মেসী তে, ইচ্ছে ছিলো মহাকাশ বিজ্ঞানী হওয়ার। ভীষন আবেগপ্রবন, স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসি খুব।লেখালেখির শখ ছোটবেলা থেকেই। তাই মাঝে মাঝে হাবিজাবি লিখে শখ মেটানোর চেষ্টা চলে। দুরন্ত ঘাস ফড়িং এর মত জীবন,লক্ষ্যহীন গন্তব্যহীন; এদিক সেদিক ছুটোছুটি শেষে ক্লান্ত আমি নিজেকে সময়ের কাছে সঁপে দিয়েছি। দেখি কোথায় নিয়ে যায় আমার নিয়তি!!

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ঃ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একজন বিখ্যাত বাঙ্গালী কবি ও ঔপন্যাসিক। তার বিখ্যাত সব উপন্যাসের মাধ্যমে তিনি বাংলা সাহিত্যিকে নিয়ে গেছেন অন্য এক উচ্চতায়। তার জন্ম ১৯৩৫ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর, বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায়। তার স্ত্রী স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায় একজন বিশিষ্ট আবৃত্তিকার। মাত্র ১৮ বছর বয়সেই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'কৃত্তিবাস' নামক একটি পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন, সেই সূত্রেই অন্তরা নামক একটি সংস্থায় যাতায়াত হত তার।

আর সেখানেই স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায়ের সাথে প্রথম দেখা সুনীলের। প্রথম দেখাতেই ভাল লাগা, বাসায় ফিরে চিঠি লিখেন তাকে। এই চিঠি আদান প্রদানের মাধ্যমেই সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হয়। মাঝে মাঝে বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে, পার্কে আড্ডা দেয়া। সবকিছুই চলছিলো ঠিকঠাক, হঠাৎ করেই স্বাতীর বিয়ে ঠিক হয় অন্য জায়গায়। খুব ভেঙ্গে পড়েন, অবশেষে অনেক বাধা বিপত্তি পেরিয়ে স্বাতী'র সাথে গাটছড়া বাঁধেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সেই থেকে আজও ভালোবাসার পবিত্র বন্ধনে জড়িয়ে আছেন দুজন।

(সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
ও
স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায়)

কাজী নজরুল ইসলামঃ

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রাণপুরুষ কবি কাজী নজরুল ইসলাম। সাম্যের কবি কাজী নজরুলের লেখনী ধূমকেতুর মাধ্যমে আঘাত হেনে বাংলা সাহিত্যকে নতুনভাবে জাগিয়ে তুলেছিল। বিদ্রোহী কবি হিসেবে পরিচিত কাজী নজরুলের জন্ম ১৮৯৯ সালের ২৪ মে, পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে। লেখাপড়া বেশীদূর গড়ায়নি, দশম শ্রেনিতেই পড়ার পাঠ চুকিয়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন তিনি। দুবছর পর তাও ছেড়ে দেন। কাজী নজরুলের সাহিত্যজীবন খুব দীর্ঘ ছিল না, তিনি বাংলাসাহিত্যের আকাশে ঝড়ের বেগে এসেছিলেন প্রেম আর বিদ্রোহের গান গেয়ে। প্রায় তিন হাজার গান ও কবিতা রচনা করেছেন তিনি।

নজরুলের জীবনে প্রথম প্রেম ছিলেন সৈয়দা খানম, ভালোবেসে নজরুল তার নাম দিয়েছিলেন নার্গিস। তিনি ছিলেন কুমিল্লা জেলার দৌলতপুর গ্রামের মেয়ে। নার্গিসের মামা আলী আকবর খানের সাথে নজরুলের ভালো বন্ধুত্ব ছিলো। নজরুলের সাহিত্য প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে আলী আকবর তার ভাগ্নীর জন্য নজরুল কে পছন্দ করেন। অবশেষে ১৯২১ সালের জুন মাসে নার্গিসের সাথে কাজী নজরুলের বিয়ে হয়, কিন্তু কাবিননামায় ঘরজামাই থাকার কথা উল্লেখ থাকায় সেই রাতেই নার্গিসকে ফেলে নজরুল কুমিল্লায় বিরজাসুন্দরী দেবীর বাড়িতে চলে আসেন, সাথে ছিলো বিরজার ছেলে বীরেন্দ্রনাথ। নজরুল মানসিকভাবে খুব ভেঙ্গে পড়েন, তার এই দুরবস্থায় তার সেবা করে তাকে সুস্থ করে তোলেন বিরজা দেবীর ভাসুরের মেয়ে প্রমীলা সেনগুপ্ত ওরফে দোলন।

(প্রমীলা সেনগুপ্ত)
ও
(কাজী নজরুল ইসলাম)

আর এভাবেই ধীরে ধীরে প্রমীলার সাথে প্রনয়ে জড়িয়ে পড়েন নজরুল। কিছুদিন পর কলকাতায় ফিরে আসেন নজরুল। এরপর ও কুমিল্লায় তার দু'একবার আসা যাওয়া হয়। ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে তৃতীয়বারের মত কুমিল্লায় আসেন নজরুল। সেখানে তার পরিচয় হয় কুমিল্লার যুবদলের নেতা সুলতান মাহমুদ মজুমদারের সাথে। তার মাধ্যমেই নজরুল প্রমীলা দেবীকে উদ্দেশ্য করে একটি কবিতা লিখে পাঠান। তখনই নজরুল আর প্রমীলার প্রনয়ের কথা জানাজানি হয়। প্রমীলা ও নজরুলের বিয়ে ও পাকাপাকি হয়, কিন্তু হঠাৎ করেই গ্রেফতার হন নজরুল। অবশেষে ১৯২৪ সালের ২৫শে এপ্রিল নজরুল প্রমীলার বিয়ে হয়। হিন্দু-মুসলমান বিয়ের কারনে অনেকেই এর বিরুদ্ধে থাকায় প্রায় চুপিচুপিই বিয়ের কাজ শেষ হয়। নানা অভাব-অনটন ও সংঘাতের মধ্যেও প্রমীলা দেবী তার সংসারকে আকড়ে রাখেন। নজরুলের জীবনে নার্গিস আর প্রমীলার মধ্যের কার ভূমিকা বেশী তা তো বলা মুশকিল। তবে দুজনেই তাদের ভালোবাসার দ্বারা নজরুলের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ন স্থান দখল করে ছিলেন।

শামসুর রহমান:

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম একজন কবি শামসুর রাহমান। যিনি সাধারনত প্রেমের কবি বা কবিতার রাজপুত্র হিসেবেই বেশী পরিচিত। তিনি তার রোমান্টিক ভাবধারার কবিতার জন্য অনেক বেশী বিখ্যাত। তার জন্ম ১৯২৯ সালের ২৪শে অক্টোবর ঢাকার মাহুতটুলীতে তার নানার কোঠাবাড়ীতে।সাহিত্যচর্চার বালাই নেই এমন এক পরিবারেই মানুষ হয়েছেন শামসুর রাহমান,তার ছেলেবেলা কেটেছে সস্তা হিন্দি সিনেমা দেখে। তার বাবা সিনেমা হলের ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন কিছুদিন। পরিবারে সাহিত্যচর্চার বালাই না থকলেও ছোটবেলা থেকেই সাহিত্য কবিতার প্রতি নেশা ছিলো শামসুর রাহমানের।১৯৪৯ সালে সোনার বাংলা পত্রিকায় তার প্রথম কবিতা ছাপা হয়।১৯৫৭ সালে কর্মজীবন শুরু করেন একটি পত্রিকার সহ-সম্পাদনার মাধ্যমে।

(শামসুর রাহমান ও জোহরা বেগম)

এক আত্মীয়ের বিয়েতে গিয়ে প্রথম দেখা হয় জোহরা বেগমের সাথে। হ্যাজাকের আলোয় প্রথম দেখাতেই ভালো লেগে যায় জোহরাকে। তারপর প্রেম,অবশেষে ১৯৫৫ সালের ৮ ই জুলাই পারিবারিক ভাবেই দুজনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। আমৃত্যু জোহরা বেগমের জীবন সঙ্গী হয়ে থাকলেও বিভিন্ন নারীর সঙ্গে বিবাহোত্তর সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন শামসুর রাহমান। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলো ঐশ্বর্যশীলা,মৃগংকা ও শরীফা খাতুন। সর্বপ্রথম তসলিমা নাসরিন তার 'ক' বইতে এই নারীদের নাম উল্লেখ করলেও শামসুর রাহমান এক পত্রিকায় দেয়া সাক্ষাতকারে নিজেও তা স্বীকার করেন। তিনি বলেন এসব নারীদের সাথে তার সম্পর্কই তার কাব্যলেখায় তাকে শক্তি যুগিয়েছে, তাকে প্রেরণা দিয়েছে। প্রথিতযশা এই কবি ২০০৬ সালের ১৭ই আগষ্ট মারা যান, কিন্তু তার বহুরূপী কাব্য প্রতিভার দ্বারা আজও বাংলার সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বল হয়ে আছেন।

শেলী:

পার্সি বিশি শেলী ছিলেন একজন বিখ্যাত ইংরেজ কবি। মাত্র ত্রিশ বছরের স্বল্প জীবনে তার রোমান্টিক ভাবধারার কবিতার জন্য তিনি বেশ আলোচিত হন।তার জন্ম ১৭৯২ সালের ৪ঠা আগস্ট ,লন্ডনে। মুক্ত চিন্তাধারার অধিকারী কবি শেলীর জীবনে প্রথম প্রেম ছিলো হ্যারিয়েট ওয়েস্টব্রুক। মাত্র ১৯ বছর বয়সে শেলী তার ১৬ বছর বয়সী স্কুলপড়ুয়া বান্ধবী হ্যারিয়েট কে নিয়ে স্কটল্যান্ডে পালিয়ে যান। ১৮১১ সালের ২৮শে আগস্ট স্কটল্যান্ডেই তারা দুজন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

বিয়ের তিন বছর যেতে না যেতেই শেলীর নিয়মহীন লাইফস্টাইলের কারনে তার স্ত্রী হ্যারিয়েটের সাথে তার সম্পর্কের চিড় ধরতে শুরু করে। অবশেষে বিয়ের তিন বছরের মাথায় শেলী তার গর্ভবতী স্ত্রীকে ফেলে লন্ডনে চলে আসেন। সেখানে এসে তিনি উইলিয়াম গডউইন এর কন্যা মেরী গডউইনের প্রেমে পড়েন,যার সাথে স্কটল্যান্ডে আগেও একবার দেখা হয়েছিলো শেলীর। মেরীর বাবা উইলিয়াম ছিলেন লন্ডনের একটি বিখ্যাত বুকশপের মালিক, ততদিনে মেরীও লেখিকা হিসেবে পরিচিতি পেয়ে গেছেন। ১৮১৪ সালের ২৮শে জুলাই শেলী মেরীকে নিয়ে সুইজারল্যান্ড চলে যান এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। ১৮১৬ সালে তারা যখন লন্ডনে ফিরে আসেন তার কিছুদিন পরই শেলীর প্রথম স্ত্রী হ্যারিয়েট পানিতে ডুবে আত্মহত্যা করেন। হ্যারিয়েটের মৃত্যুর কিছুদিন পর ১৮১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর শেলী ও মেরী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু সেই সম্পর্ক ও বেশীদিন টিকেনি। স্ত্রী আত্মহত্যা ও সন্তানের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারনে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত শেলী নিজেই তার স্ত্রী মেরীকে তার বন্ধু হগ এর সম্পর্ক স্থাপনের জন্য প্ররোচনা দিতে থাকেন। অবশেষে মেরী হগ এর সাথে বসবাস শুরু করলে শেলী তার স্ত্রীর কাছ থেকে আলাদা হয়ে যান। ১৮২২ সালের ৮ই জুলাই মাত্র ৩০ বছর বয়সে এক জাহাজ দুর্ঘটনায় শেলী মারা যান।

(পার্সি শেলী
ও মেরী শেলী)

ভালোবাসা চিরন্তন। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভালোবাসাকে জটিল ও সাধারন দুভাবেই উপস্থাপন করা যায়। কবি সাহিত্যকদের জীবনে প্রেম ভালোবাসা ও আবেগ অপরিসীম গুরুত্ব বহন করে,যা তাদের লেখায় ও প্রভাব ফেলে। ভালোবাসা নিয়ে কঠিন কোন বিশ্লেষনে বা তর্কে নাহয় না ই গেলাম আমরা। চিরন্তন পবিত্র এই অনুভূতির সমুদ্রে অবগাহন করে নিজেকে শুদ্ধ করে গড়ে তোলার চেষ্টাই হোক আমাদের কাম্য।

তথ্যসূত্রঃ

প্রথমআলো (১ম খন্ড)-সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
http://www.sunilgangopadhyay.com/swati.html
নজরুলের জীবনে প্রেম ও নারী- ডঃআবুলআজাদ
হোটেল গ্রেভার ইন- হুমায়ুন আহমেদ
http://en.wikipedia.org/wiki/Percy_Bysshe_Shelley
www.eaward.org.bd
দৈনিক ইনকিলাব (২৭/৭/২০০৩)
http://bichitraa.blogspot.com/2010/05/blog-post_11.html

অমর একুশে বইমেলায় প্রকাশিত শৈলারদের বই.....

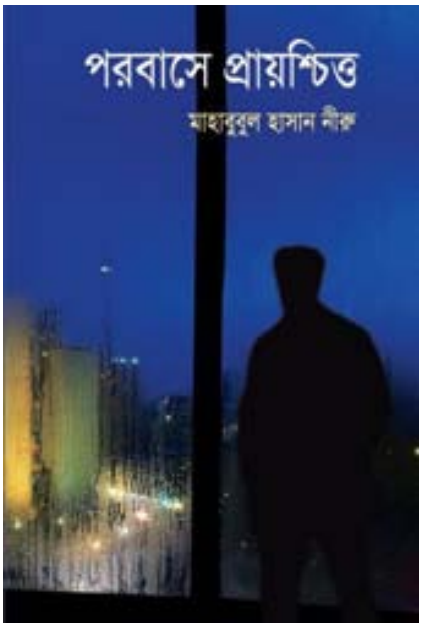

সুখবর:

এখন থেকে প্রতি বইমেলায় শৈলারদের লেখা সম্বলিত একটি করে বই বের করা হবে।

"একটি সুন্দর সাহিত্য আকাশের প্রত্যাশায়"

.....আমরা আমাদের মত থাকতে চাই। শুভাশিষ।

-শৈলী টিম

-- একটি শৈলী প্রকাশনা --

শৈলী

ভালোবাসা সংখ্যা, ২০১১

শৈলী.কম -এর ভালবাসা আয়োজন,
১৪ই ফেব্রুয়ারী ২০১১

http://shoily.com

আড্ডা হোক শুদ্ধতায়, শিল্প আর সাহিত্যে।